সত্যের আহ্বান

اِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامُ

(আল্লাহর নিকট ধর্ম কেবল ইসলাম)

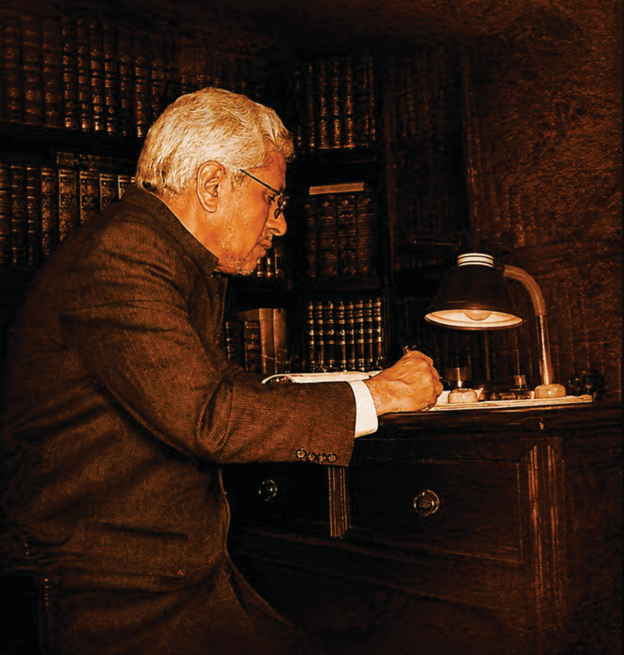

জাভেদ আহমেদ গামিদি

সত্যের আহ্বান

সত্যের আহবান

জাভেদ আহমেদ গামিদি

বাংলা অনুবাদ ও সম্পাদনা
ইমদাদ হোসেন

আল-মাওরিদ
জ্ঞান ও গবেষণা প্রতিষ্ঠান

সূচিপত্র

আমাদের আহ্বান ৯

খোদাতায়ালার ওপর ঈমান ১৫

মূলনীতি ও ভিত্তি ৪৪

সত্য ধর্ম ৫১

ইসলাম ও রাষ্ট্র ৯৪

নাহি আনিল মুনকার ১২১

মুখবন্ধ

ইসলাম আল্লাহতায়ালার মনোনীত ধর্ম। এই ধর্মের সঠিক ব্যাখ্যা কী? এই পুস্তিকাটি মূলত তারই বিবরণ এবং এই ব্যাখ্যার দিকে আহ্বান জানাতেই রচিত হয়েছে। এই পুস্তিকাতে যে লেখাগুলো সংকলিত হয়েছে, তা সংক্ষেপে ইসলামের পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটিয়ে তোলে, যার বিশদ ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ আমরা আমাদের 'মিজান' বইয়ে উপস্থাপন করেছি। এর উদ্দেশ্য: সাধারণ মানুষ থেকে জ্ঞানী-গুণী নির্বিশেষে সবার নিকট ইসলামের এই সঠিক বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

খিজির দেখিয়েছিল যে পথ, তাতে ঝরনা ছিল বহুদূরে,
তীব্র তৃষ্ণাই নতুন পথের সন্ধান দিল মোদের অন্তরে।

— জাভেদ

ডালাস, যুক্তরাষ্ট্র

৫ জানুয়ারি, ২০২৬ খ্রিস্টাব্দ

بسم الله الرحمن الرحيم

আমাদের আহ্বান

ধর্ম আল্লাহতায়ালার হেদায়েত, যা তিনি প্রথমত মানুষের সহজাত প্রকৃতিতে গেঁথে দিয়েছেন। এরপর ধর্মের প্রয়োজনীয় সকল বিবরণ নিজের নবীদের মাধ্যমে মানুষকে দান করেছেন। নবীদের মাধ্যমে ধর্মের প্রয়োজনীয় সকল বিবরণ প্রদানের যে সিলসিলা চলমান ছিল, সেই সিলসিলার শেষ নবী হলেন: মুহাম্মদ (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)। সুতরাং ধর্মের একমাত্র উৎস এখন তার মহান ব্যক্তিসত্তা ছাড়া আর কিছু নয়। তিনি নিজের কথা, কাজ ও মৌন সম্মতির মাধ্যমে যে বিষয়গুলোকে ধর্ম হিসেবে নির্ধারণ করেছেন, সেগুলোই সত্য ধর্ম।[১]

---

[১] কুরআন, সুরা জুমুআ, ৬২:২।

দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে আমরা এই ধর্মের ওপর ঈমান আনতে এবং এই মোতাবেক নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের আত্মশুদ্ধির আহ্বান জানাই। যারা এই আহ্বান কবুল করবে, তাদের প্রতিদান আল্লাহর জান্নাত, যার প্রশস্ততা পুরো মহাবিশ্বের প্রশস্ততার সমান; যেখানে জীবনের সাথে মৃত্যু, আনন্দের সাথে বেদনা, খুশির সাথে দুঃখ, প্রশান্তির সাথে অস্থিরতা, আরামের সাথে কষ্ট এবং নিয়ামতের সাথে আজাবের কোনো চিন্তা নেই; যার আরাম স্থায়ী, যার স্বাদ অসীম, যার দিন-রাত চিরন্তন, যার নিরাপত্তা অবিনশ্বর, যার আনন্দ অক্ষয়, যার সৌন্দর্য চিরস্থায়ী এবং পূর্ণতা সীমাহীন। আল্লাহ-তায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য এতে এমন কিছু প্রস্তুত রেখেছেন, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয় তা কখনো কল্পনাও করেনি।[২]

বর্তমানে যারা এই ধর্ম মেনে চলছেন, আমরা তাদের আহ্বান জানাই: আল্লাহর এই জান্নাতে প্রবেশের সৌভাগ্য লাভের জন্য তারা

[২] কুরআন, সুরা আলা, ৮৭:১৪-১৭।

যেন নিজেদের কাজ-কর্মকে নিজেদের ঈমানের অনুরূপ বানিয়ে নেন। আল্লাহ ও তাঁর বান্দাদের হক পূর্ণ সততা ও পূর্ণ ইখলাসের সাথে আদায় করেন এবং কারো জান-মাল ও ইজ্জত নিয়ে কোনো বাড়াবাড়ি না করেন।[৩]

আমরা তাদের আহ্বান জানাই: নিজেদের পরিবেশে, নিজেদের কর্মক্ষেত্রে তারা একে অপরকে ভালোর উপদেশ দেবেন এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখবেন। এটি সেই ফরজ কাজ, যা তাদের প্রতিপালক তাদেরকে দায়িত্ব হিসেবে অর্পণ করেছেন। এই ফরজ পিতার জন্য সন্তানের প্রতি এবং সন্তানের জন্য পিতার প্রতি; স্বামীর জন্য স্ত্রীর প্রতি এবং স্ত্রীর জন্য স্বামীর প্রতি; ভাইয়ের জন্য বোনের প্রতি এবং বোনের জন্য ভাইয়ের প্রতি; বন্ধুর জন্য বন্ধুর প্রতি এবং প্রতিবেশীর জন্য প্রতিবেশীর প্রতি; অর্থাৎ প্রত্যেকে নিজের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ক্ষেত্রে এই ফরজ কাজটি আদায় করবেন। সুতরাং তারা যখন দেখবে, তাদের সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের কেউ সত্যবিরোধী পথ অবলম্বন

৩ কুরআন, সুরা নাহল, ১৬:৯০।

করেছে, তখন তাদের উচিত নিজেদের জ্ঞান, নিজেদের মেধা ও যোগ্যতা অনুযায়ী তাকে সত্য পথ অবলম্বনের উপদেশ দেওয়া।[৪]

ধর্ম ও দুনিয়ার কোনো বিষয়ে তাদের আবেগ, গোঁড়ামি, স্বার্থ ও কামনা-বাসনা যদি তাদেরকে ন্যায়ের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়, তবে তারা যেন সত্য ও ন্যায়ের ওপর অটল থাকেন; এমনকি যদি সত্যের সাক্ষ্য দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে, তবে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে হলেও যেন তারা সেই দাবি পূরণ করেন। তারা সর্বদা সত্য কথা বলবেন, সত্যের সামনে মাথা নত করবেন, ন্যায়ের সাক্ষ্য দেবেন এবং নিজেদের বিশ্বাস ও কর্মে ন্যায়বিচার ছাড়া অন্য কিছু কখনোই গ্রহণ করবেন না।[৫]

তাদেরকে যদি ধর্মীয় নির্যাতনের (persecution) লক্ষ্যবস্তু বানানো হয়, তবে সহিংসতার জবাবে সহিংসতার পথ অবলম্বনের

৪ কুরআন, সুরা তওবা, ৯:৭১।

৫ কুরআন, সুরা নিসা, ৪:১৩৫; মায়েদা, ৫:৮।

পরিবর্তে ধৈর্য ধারণ করবেন[৬] এবং সম্ভব হলে যেখানে সহিংস পরিস্থিতির সম্মুখীন হতে হয়, সে স্থান ছেড়ে এমন স্থানে হিজরত করবেন, যেখানে তারা প্রকাশ্যে নিজেদের ধর্ম পালন করতে পারেন।[৭]

মাদরাসা-এ-ফারাহির শ্রেষ্ঠ আলেমগণ আল্লাহর তাওফিকে বর্তমান যুগে সত্য ধর্মকে 'ফিকাহ', 'কালাম', 'দর্শন' ও 'তাসাউফ'-এর সমস্ত মিশ্রণ থেকে আলাদা করে কোনো রকম হেরফের ছাড়াই কুরআন ও সুন্নাতের ভিত্তিতে পেশ করেছেন। এই ধর্মের প্রচার-প্রসার, এই ধর্ম মোতাবেক মানুষের *তালিম* ও *তারবিয়াত* তথা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ এবং এর আলোকে মুসলমানদের ধর্মীয় চিন্তার পুনর্গঠন সত্যিকার অর্থেই বড় জিহাদ। আমরা তাদের আহ্বান জানাই: নিজেদের সমর্থন, নিজেদের সময় এবং নিজেদের সামর্থ্য দিয়ে তারা এই জিহাদে আমাদের সাহায্য করবেন। এই সাহায্য মূলত আল্লাহর সত্য ধর্মকেই সাহায্য করা। একজন

---

[৬] কুরআন, সুরা হামিম সাজদা, ৪১:৩৩-৩৫।

[৭] কুরআন, সুরা নিসা, ৪:৯৭।

মুমিন বান্দার কাছে আল্লাহর সত্য ধর্মকে সাহায্য করার চেয়ে আর কিছুই প্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে না।[৮]

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ.

“হে ঈমানদারগণ, তোমরা আল্লাহতায়ালার সাহায্যকারী হও, যেমন ঈসা ইবনে মরিয়ম তার সহচরদের বলেছিলেন: ‘আল্লাহ-তায়ালার পথে কে আমার সাহায্যকারী হবে?’ সহচরগণ জবাবে বলে: ‘আমরাই আল্লাহ-তায়ালার সাহায্যকারী।’” (কুরআন, সুরা সফ, ৬১:১৪)

---

[৮] কুরআন, সুরা তওবা, ৯:২৪।

খোদাতায়ালার ওপর ঈমান

মানুষ হলো সৃষ্টজীব (মাখলুক)। ধর্মের মূল বক্তব্য এই সত্যের উপলব্ধি থেকেই শুরু হয়। এটি এক অস্তিত্বগত বাস্তবতা, যা আমরা যখন খুশি নিজ চোখে পর্যবেক্ষণ করতে পারি। আমরা জানি, মানুষের সৃষ্টি কোন ধরনের প্রাণহীন উপাদান দিয়ে হয়। আমাদের খাদ্যের মাধ্যমে এগুলো কোথায় এবং কোন কারখানায় (Factory) যায়। আমরা জানি, এগুলোর মধ্যে মানুষের কোনো বীজ থাকে না এবং এমন কোনো জিনিসও থাকে না, যা পদার্থকে জীবনে এবং জীবনকে চেতনায় রূপান্তর করতে পারে। কিন্তু এই খাদ্যই যখন একটি বিশেষ স্থানে পৌঁছায়, তখন তা সেই বীর্যে পরিণত হয়, যার মধ্যে মানুষ হয়ে ওঠার যোগ্যতাসম্পন্ন বীজ বিদ্যমান থাকে। একজন পুরুষের দেহ থেকে একই সময়ে যে পরিমাণ বীর্য নির্গত হয়, তাতে

লক্ষ লক্ষ ও কোটি কোটি বীজের অস্তিত্ব থাকে। এগুলোর প্রতিটি এই সক্ষমতা রাখে যে, তা যদি নারীর ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়, তবে তা পূর্ণাঙ্গ মানুষে পরিণত হতে পারে। নারীর এই ডিম্বাণুগুলোও একইভাবে অন্য একটি কারখানায় (Factory) তৈরি হয়। আমরা দেখতে পাই, বীর্য যখন ডিম্বাণুর সাথে মিলিত হয়, তখন শুরুতে যা অস্তিত্ব লাভ করে, তা এতই ক্ষুদ্র যে অণুবীক্ষণ যন্ত্র ছাড়া দেখা দুষ্কর। অথচ এই তুচ্ছ বস্তুরই বিবর্তন ঘটে; নয় মাস কয়েক দিনের ব্যবধানে এক ফোঁটা পানি থেকে তা রক্তপিণ্ডে, রক্তপিণ্ড থেকে মাংসপিণ্ডে এবং মাংসপিণ্ড থেকে হাড় ও হাড়ের ওপর মাংসের আবরণে সজ্জিত সম্পূর্ণ এক ভিন্ন সত্তায় রূপান্তর লাভ করে মায়ের গর্ভ থেকে বেরিয়ে আসে। অতঃপর এই পৃথিবীতে সে তার বিস্ময়কর শক্তি ও সামর্থ্য দিয়ে জ্ঞান-যুক্তি, বুদ্ধি-প্রজ্ঞা এবং শিল্প-শৈলীর এমনসব উৎকর্ষ প্রদর্শন করে, যা আজ জগতের সর্বত্র দৃশ্যমান।

আমরা এই সৃষ্টিকে দেখি এবং আমাদের চেতনার গঠনের কারণেই আমরা এর স্রষ্টাকে খুঁজতে বাধ্য হই। প্রতিটি জিনিসের স্রষ্টা থাকতে

হবে— বিষয়টি এমন নয়, বরং প্রতিটি ‘সৃষ্টির’ একজন স্রষ্টা থাকতে হবে। এই ‘সৃষ্টি নামক কর্মই’ আমাদেরকে এই অনুসন্ধানে বাধ্য করে। আমরা এই সহজাত তাড়না নিয়েই জন্মেছি। তাই আমরা কখনো কার্যের জন্য কারণ (Cause behind an effect) এবং কর্মের জন্য কর্তার (Agent behind an action) অনুসন্ধান বাদ দিয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারি না। দর্শন, বিজ্ঞান এবং সুফিবাদের মহীরুহদের একে একে দেখে নিন, কেউই এ থেকে বিমুখ থাকতে পারেননি। সুতরাং জ্ঞানের পুরো ইতিহাস এই বাস্তবতার স্বীকৃতির ইতিহাস যে, প্রতিটি সৃষ্টির একজন স্রষ্টা আছেন; মানুষ সৃষ্টি, অতএব মানুষেরও একজন স্রষ্টা আছেন।

শুধু তাই নয়, আমরা এটাও জানি যে, সৃষ্টির যে কর্ম আমরা পর্যবেক্ষণ করেছি, তা সুচিন্তিত এবং এর প্রতিটি অংশে অসীম ক্ষমতা, অনন্য জ্ঞান ও প্রজ্ঞার প্রকাশ ঘটেছে। আমরা যেমন সৃষ্টিকে অস্বীকার করতে পারি না, তেমনি এই কর্মের প্রকৃতিকেও অস্বীকার করতে পারি না। কারণ, এই কর্মের প্রকৃতিও ঠিক তেমনই এক বাস্তবতা, যেমন সৃষ্টির কর্মও একটি

বাস্তবতা। আমরা যেভাবে কর্ম পর্যবেক্ষণ করি, ঠিক সেভাবেই এই বাস্তবতাকেও পর্যবেক্ষণ করি। সুতরাং আমরা এ কথা স্বীকার করতেও বাধ্য যে, মানুষের স্রষ্টা ইচ্ছাশক্তির অধিকারী, তাঁর ক্ষমতা অসীম এবং তিনি মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়।

মানুষের বুদ্ধি তাকে এই পর্যন্ত নিয়ে আসে। এই সফরে তার বাহির থেকে কোনো নির্দেশনার প্রয়োজন হয় না। জ্ঞান ও উপলব্ধির যে সক্ষমতা মানুষকে তার জন্মের সাথে দান করা হয়েছে, সেটি-ই এই সফরে পথ দেখানোর জন্য যথেষ্ট। কিন্তু এর পরের প্রশ্ন হলো: সেই স্রষ্টা কে? এই প্রশ্নের উত্তর মানুষের বুদ্ধি এমন অকাট্য নিশ্চয়তা ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দিতে পারে না। তাই সে সাধারণত ওই দুটো উত্তরের দিকে তাকায়, যা মানবজাতির পুরো ইতিহাসে এ যাবৎকাল পর্যন্ত দেওয়া হয়েছে। ওই দুটো উত্তর থেকে সে কোনো একটি বেছে নেয়; অথবা সে উত্তর দুটোর মাঝে দোদুল্যমান থাকে।

প্রথম উত্তরটি হলো, মানুষ যে মহাবিশ্বের কোলে চেতনার চোখ খোলে, সেই মহাবিশ্বই তার স্রষ্টা। এটি নাস্তিক্যবাদের উত্তর।

প্রথম উত্তরের ব্যাখ্যা সাধারণত এভাবে করা হয় যে, মহাবিশ্বের নিজস্ব চেতনা আছে, ফলে মহাবিশ্বের অভ্যন্তরেই এমন এক শক্তি বিদ্যমান, যা তার সত্তাগত দিক থেকে 'সৃষ্টিকর্তা'। মহাবিশ্বের বাইরে আর কিছু নেই, এমনকি ভেতর ও বাইরের পার্থক্যটুকুও মহাবিশ্বের ভেতরেই সীমাবদ্ধ। মহাবিশ্বের প্রতিটি অংশ একদিকে যেমন তার অভ্যন্তরীণ সত্তা, অন্যদিকে তার বাহ্যিক প্রকাশও বটে। এটি Cause and effect relationship তথা কার্যকারণ সম্পর্কের এক বিশাল কারখানা হতে পারে, তবে সামগ্রিক বিচারে এটি নিজেই নিজের চূড়ান্ত কারণ (Ultimate Cause)।

এই উত্তরটি নিছক একটি দাবি।

প্রথমত এই কারণে যে, এতে মহাবিশ্বের যে নিজস্ব চেতনার দাবি করা হয়েছে, তার কোনো প্রমাণ আমাদের পর্যবেক্ষণে কখনো আসেনি। আমরা জানি, মহাবিশ্বের মূল সত্তা

হলো পদার্থ (Matter), আর পদার্থের কোনো ইচ্ছা শক্তি নেই। এমনকি পদার্থ জ্ঞান ও বুদ্ধি থেকেও শূন্য অর্থাৎ সম্পূর্ণ অচেতন। জ্ঞান, বুদ্ধি ও ইচ্ছাশক্তির মতো গুণ যদি কোথাও কোনো মাত্রায় পাওয়া যায়, তবে তা সেই ‘সৃষ্টির’ মাঝেই পাওয়া যায়, যার স্রষ্টা হিসেবে এই মহাবিশ্বকে দাবি করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, কোনো কিছুকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষমতাও যদি কোথাও কোনো পর্যায়ে থেকে থাকে, তবে তা সেই ‘সৃষ্টির’ মাঝেই রয়েছে। কোনো কিছুকে বাস্তবে রূপ দেওয়ার ক্ষমতা ছাড়া জ্ঞান, বুদ্ধি কিংবা ইচ্ছার প্রকৃত কোনো মূল্য থাকে না।

দ্বিতীয়ত এই কারণে যে, মহাবিশ্ব থেকে শক্তির যে বহিঃপ্রকাশকে ‘সৃষ্টি প্রক্রিয়া’ বলে অনেকে ভুল করেন, তা আসলে জড় পদার্থের সহজাত বৈশিষ্ট্য এবং তার ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফল মাত্র। শক্তির এমন প্রকাশ তো মানুষের তৈরি প্রতিটি স্বয়ংক্রিয় যন্ত্রের কলকব্জাতেও দেখা যায়; যার চরম উৎকর্ষ বর্তমানে ‘কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তা’ (Artificial Intelligence) রূপে আমাদের প্রত্যেককে প্রতিনিয়ত বিস্মিত করছে।

তৃতীয়ত এই কারণে যে, এই মহাবিশ্বের যদি কোনো সামগ্রিক সত্তা থেকেও থাকে, তবে তা সেসব বস্তুগত প্রভাব ও বৈশিষ্ট্যেরই সমষ্টি, যা কেবল কার্যকারণ সম্পর্কের একটি শৃঙ্খল তৈরি করে। এর সাথে সৃষ্টির সেই মহান কার্যের কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই, যা প্রতিটি পদে পদে জ্ঞান, বুদ্ধি, অভিপ্রায় এবং সৃজনশীল ক্ষমতার দাবি রাখে। এটি নিছক উপায়-উপকরণ, কর্মপদ্ধতি আর প্রাকৃতিক নিয়মের একটি জগৎ; এর বাইরে এর কোনো স্বতন্ত্র বা অতিপ্রাকৃত মর্যাদা নেই।

'মানুষের স্রষ্টা কে?' এই প্রশ্নের দ্বিতীয় উত্তরটি দিয়েছেন তারা, যারা নিজেদের 'নবী' হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। মানুষকে এই উত্তর তার সৃষ্টির একদম শুরুতেই প্রদান করা হয়েছিল। ফলে প্রথম মানুষটি যেভাবে প্রথম মানুষ ছিল, ঠিক তেমনি সে প্রথম নবীও ছিল। এ বিষয়ে পরবর্তীতে আমরা যেসব বিস্তারিত তথ্য জানতে পারি, তার সারকথা হলো: মানুষের স্রষ্টা এই মহাবিশ্বের ঊর্ধ্বে বিদ্যমান এক পরম জ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময় সত্তা। মানুষের সৃষ্টির সূচনা হয়েছিল মাটির গভীরে। মাটির যে

উপাদানগুলো বর্তমানে খাদ্যের মাধ্যমে আমাদের দেহে প্রবেশ করে এবং এক বিন্দু তুচ্ছ জলীয় নির্যাসের রূপ নিয়ে মানব সৃষ্টির প্রক্রিয়া শুরু করে, সেদিন সেগুলো পচা কাদার ভেতরে ঠিক একইভাবে এক বিশেষ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়েছিল। দৈহিক কাঠামো পূর্ণতা না পাওয়া পর্যন্ত এই প্রক্রিয়া চলতে থাকে। এক পর্যায়ে কাদার উপরিভাগ শুকিয়ে শক্ত মাটিতে পরিণত হয়। অতঃপর তা বিদীর্ণ হয়ে সেখান থেকে আত্মপ্রকাশ করে এক জীবন্ত প্রাণী, যা মানুষের প্রাথমিক বা আদিম জৈবিক সত্তারই প্রতিনিধিত্ব করে। পরবর্তীকালে পৃথিবীর বুকে ঘটে যাওয়া নানা রূপান্তর ও বিবর্তনের প্রভাব জ্ঞান ও উপলব্ধি শক্তিহীন এই অপরিপক্ব প্রাণীর ভেতরেও সঞ্চারিত হতে শুরু করে। কয়েক প্রজন্মের পারস্পরিক সংমিশ্রণ ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে মানুষের এই আদি রূপটি ধীরে ধীরে মার্জিত ও সুবিন্যস্ত হয়ে ওঠে এবং শেষ পর্যন্ত পূর্ণাঙ্গ ‘ব্যক্তিত্ব’ ধারণের উপযোগী পর্যায়ে পৌঁছায়। পরিশেষে, এক সূক্ষ্ম ফুৎকারের মাধ্যমে তাকে সেই ব্যক্তিত্ব দান করা হয়, যা

আমাদের চেনা মানবজাতির সৃষ্টির চূড়ান্ত ধাপ হিসেবে চিহ্নিত।

وَبَدَأَ خَلْقَ الْإِنسَانِ مِن طِينٍ ﴿٧﴾ ثُمَّ جَعَلَ نَسْلَهُ مِن سُلَالَةٍ مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ ﴿٨﴾ ثُمَّ سَوَّاهُ وَنَفَخَ فِيهِ مِن رُّوحِهِ وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ ﴿٩﴾

“মানুষের সৃষ্টির সূচনা তার স্রষ্টা করেছিলেন মাটি থেকে; অতঃপর এক তুচ্ছ তরলের নির্যাস থেকে তিনি তার বংশধারা অব্যাহত রেখেছেন। এরপর তিনি তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ সুবিন্যস্ত ও সুশোভিত করেছেন এবং তার ভেতরে ফুঁকে দিয়েছেন নিজের রুহ। আর তিনি তোমাদের দিয়েছেন (শোনার জন্য) কান, (দেখার জন্য) চোখ এবং (উপলব্ধির জন্য) অন্তর; অথচ তোমরা খুব সামান্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো।” (কুরআন, সাজদা, ৩২:৭-৯)

এই উত্তরটি সর্বশেষ যে মাধ্যমে প্রদান করা হয়েছে, তা হলো এই কুরআন: যার আয়াতসমূহ ওপরে উদ্ধৃত হয়েছে। যে নবী এটি উপস্থাপন করেছেন, তার দাবি হলো: এটি

স্রষ্টার নিজস্ব কালাম, যা তার ওপর নাজিল করা হয়েছে। ঠিক যেভাবে তা নাজিল করা হয়েছে, তিনি হুবহু সেভাবে মানুষকে পাঠ করে শুনিয়েছেন। এতে তিনি না একটি অক্ষর পাল্টেছেন, আর না পরিবর্তন করেছেন একটি চিহ্ন। আর কিয়ামত পর্যন্ত এমন কেউ নেই, যে কিনা কুরআনে পরিবর্তনের দুঃসাহস দেখাবে।

তাই ঘোষণা করা হয়েছে: তোমরা যদি কুরআনকে আল্লাহর কিতাব বলে মনে না করো, তবে এর হেদায়েত, বিষয়বস্তু এবং বর্ণনাভঙ্গির বিচারে এটি যে মানের বাণী, সেই মানের অন্তত একটি মাত্র সুরাও তৈরি করে পেশ করো, যদি তোমরা তোমাদের এই ধারণায় সত্যবাদী হয়ে থাক:

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ.

“যদি এ বিষয়ে তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে, তবে (যাও এবং) এর মতো কেবল একটি সুরা তৈরি করে নিয়ে আসো; (আর এ কাজের জন্য) আল্লাহ ছাড়া তোমাদের যত

সাহায্যকারী আছে, তাদের সবাইকে ডেকে নাও, যদি তোমরা তোমাদের এই দাবিতে সত্যবাদী হয়ে থাক।” (কুরআন, বাকারা, ২:২৩)

কুরআনে এই দাবিটি একাধিক স্থানে বর্ণিত হয়েছে এবং এর পাশাপাশি অত্যন্ত স্পষ্ট একটি মানদণ্ডও উপস্থাপন করেছে, যার ভিত্তিতে আমরা ফয়সালা করতে পারি যে, কুরআন কি আসলেই স্রষ্টার কালাম, নাকি কোনো মানুষ নিজে রচনা করে মনগড়াভাবে তা স্রষ্টার সাথে সম্পৃক্ত করেছে?

সেই মানদণ্ড কী? নিচের তিনটি পয়েন্টে আমরা সেই মানদণ্ডকে উপস্থাপন করতে পারি:

প্রথমত, মানুষ যে জ্ঞানই সৃজন করুক না কেন, শব্দ ও অর্থ উভয় দিক থেকেই তাকে ‘ভুল ও সংশোধন’ (Trial and Error)-এর বহু ধাপ পার হয়ে আসতে হয়। জন্মের প্রথম দিনেই কেউ সক্রেটিস বা প্লেটো হয়ে যায় না; রাতারাতি কেউ গালিব, শেক্সপিয়ার কিংবা নিউটন ও আইনস্টাইন হয়ে ওঠে না। বরং মানুষ শেখে, উপলব্ধি করে এবং শেখার প্রতিটি ধাপে

ভুল করে আবার তা সংশোধনও করে। আমরা দেখতে পাই, মানুষ বছরের পর বছর ধরে তার পূর্বসূরিদের জ্ঞান আহরণ করে, তা নিয়ে নিরন্তর চর্চা ও সাধনা চালায় এবং ধাপে ধাপে উন্নতির দিকে এগিয়ে যায়; পরিশেষে তার হাত ধরে জ্ঞান বা সাহিত্যের কোনো কালজয়ী সৃষ্টির আত্মপ্রকাশ ঘটে। এটিই মানুষের চিরায়ত নিয়তি এবং এভাবেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে। জ্ঞান ও সাহিত্যের সুদীর্ঘ ইতিহাসে এর কোনো ব্যতিক্রম কখনো পরিলক্ষিত হয়নি এবং ভবিষ্যতেও তেমন কিছু কল্পনা করা যায় না।

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হলো: কুরআন এই সর্বজনীন নিয়মের এক অনন্য ব্যতিক্রম। এটি যার মাধ্যমে প্রকাশিত হয়েছে, সেই মহান ব্যক্তিটি কয়েকশ ঘরের এক ক্ষুদ্র জনপদে দীর্ঘ চল্লিশ বছর ধরে নিজ জাতির চোখের সামনেই দিন-রাত অতিবাহিত করেছেন। এই দীর্ঘ সময়ে তার প্রতিটি কর্মকাণ্ড সকলের কাছে ছিল সম্পূর্ণ স্পষ্ট ও দৃশ্যমান; অথচ সাধারণ মানুষের জ্ঞানার্জনের ক্ষেত্রে ‘ভুল ও সংশোধন’-এর যে চিরাচরিত প্রক্রিয়া অনিবার্য, তার জীবনে সেটির সামান্যতম চিহ্নও কেউ কখনো দেখতে পায়নি।

ফলে তাদের কাছে এটি ছিল অত্যন্ত বিস্ময়কর যে, তাদেরই মাঝে সত্যবাদী ও বিশ্বস্ত (*সাদিক ও আল-আমিন*) হিসেবে সুপরিচিত একজন মানুষ কীভাবে নিজে থেকে এমন গভীর জ্ঞান ও প্রাঞ্জল বাণীর অধিকারী হতে পারেন! উপায়ান্তর না পেয়ে তারা তখন ধারণা করতে শুরু করে যে, নিশ্চয়ই কোনো শিক্ষিত অনারব ব্যক্তি তাকে এসব তথ্য শিখিয়ে দিচ্ছে। তাদের এই সংশয় ও অপবাদের জবাবে কুরআন নিজেই বিষয়টি স্পষ্ট করে দিয়েছে:

قُل لَّوْ شَاءَ اللَّهُ مَا تَلَوْتُهُ عَلَيْكُمْ وَلَا أَدْرَاكُم بِهِ فَقَدْ لَبِثْتُ فِيكُمْ عُمُرًا مِّن قَبْلِهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ ﴿١٦﴾ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾

"(আপনি তাদের) বলুন, 'আল্লাহ যদি চাইতেন, তবে আমি তোমাদের কাছে এই কুরআন পাঠ করে শোনাতাম না এবং আল্লাহও তোমাদেরকে এ বিষয়ে অবহিত করতেন না। এটি সম্পূর্ণ তাঁরই সিদ্ধান্ত; কেননা এর আগে তো আমি তোমাদের মাঝে

জীবনের দীর্ঘ এক সময় অতিবাহিত করেছি। (তখন কি তোমরা কখনো আমার মুখে এমন কথা শুনেছ?) তবুও কি তোমরা সামান্যতম বুদ্ধিও প্রয়োগ করবে না?' অতএব, তার চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে, যে আল্লাহর ওপর মিথ্যা আরোপ করে কিংবা তাঁর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করে? সত্য তো এই যে, এমন অপরাধীরা কখনোই সফল হতে পারে না।" (কুরআন, ইউনুস, ১০:১৬-১৭)

বক্তব্যটি ছিল মূলত এমন: হে নির্বোধের দল! তোমরা আমাকে কবে এসব বিষয়ে উৎসাহী দেখেছ? কিংবা এসব নিয়ে কোনো চিন্তাভাবনা ও মতামত ব্যক্ত করতে দেখেছ? অথবা এগুলোর সংকলন ও বিন্যাসের জন্য কোনো চর্চা ও সাধনায় নিমগ্ন হতে দেখেছ? কিংবা এ-সংক্রান্ত কোনো জ্ঞান ও বিদ্যা অর্জন করতে দেখেছ, যেগুলো আজ কুরআনের সুরাগুলোতে একের পর এক আলোচিত হচ্ছে? দীর্ঘ চল্লিশ বছর আমি তোমাদের মাঝে অতিবাহিত করেছি। আমার কথাবার্তা কিংবা আচার-আচরণের মধ্যে তোমরা কবে এমন কিছু প্রত্যক্ষ করেছ, যাকে এই দাওয়াতের সূচনা বা

পূর্বপ্রস্তুতি বলা যেতে পারে? আজ আমি যা উপস্থাপন করছি, তার ক্রমবিকাশ বা ধারাবাহিক বিবর্তনের কোনো চিহ্ন কি তোমরা কখনো আমার অতীতে পেয়েছ? তোমরা তো ভালো করেই জানো যে, মানবেতিহাসে মানুষের মস্তিষ্ক তার বয়সের কোনো পর্যায়েই হঠাৎ এমন কিছু পেশ করতে পারে না, যার বিকাশ বা অগ্রগতির ছাপ তার পূর্ববর্তী ধাপে বিদ্যমান থাকে না। অথচ তোমরা দাবি করছ যে, আমি আল্লাহর নামে মিথ্যা বলছি! এর আগে কোনো মিথ্যা, প্রতারণা, জালিয়াতি বা ধূর্ততার সামান্যতম ছোঁয়াও কি কখনো আমার চরিত্র ও স্বভাবে প্রত্যক্ষ করেছ? আজ অবধি তোমরা আমাকে 'সাদিক' (সত্যবাদী) ও 'আমিন' (বিশ্বস্ত) বলেই জেনে এসেছ; এখন কীভাবে বলছ যে, সেই *সাদিক* ও *আমিন* রাতারাতি এক অহংকারী, চরম মিথ্যাবাদী ও মিথ্যাচারীতে পরিণত হলো? হে আল্লাহর বান্দারা, তোমরা কেন সামান্যতম বুদ্ধিও প্রয়োগ করছ না?

দ্বিতীয়ত, মানুষের জ্ঞান কখনোই স্ববিরোধিতা থেকে মুক্ত হতে পারে না। 'গড়লাম, পূজা করলাম, আবার ভেঙে

ফেললাম'— চিন্তার সূচনা থেকে শেষ অবধি মানুষের পথচলায় মূলত এই ভাঙা-গড়ার গল্পই অব্যাহত থাকে। গভীর বিচারে দেখা যায়, এটিও প্রকৃতপক্ষে সেই 'ভুল ও সংশোধন' প্রক্রিয়ারই ফল, যার কথা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। কেবল জ্ঞানের ক্ষেত্রে নয়, মানুষের এই চিন্তাধারা যখন সাহিত্যের রূপ পরিগ্রহ করে, সেখানেও ফুটে ওঠে একই চিত্র। মানুষের সৃজনশীল কর্মগুলোকে সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখলে ছন্দ, অলংকার ও ভাববিন্যাসের মধ্যে বিস্তর তারতম্য চোখে পড়ে। তার বাচনভঙ্গি কোথাও হয়তো অলৌকিক সৌন্দর্যে ভাস্বর হয়ে ওঠে, আবার কোথাও হয়ে পড়ে অত্যন্ত সাধারণ, এমনকি অসংলগ্ন। বাস্তব সত্য এই যে, পৃথিবীতে এমন কোনো মানুষের জন্ম হয়নি, যিনি বৈচিত্র্যময় বিষয় ও ভিন্ন ভিন্ন পরিস্থিতিতে অলংকার ও বাচনভঙ্গির এমন এক উচ্চ স্তরে অবস্থান করে নিরবচ্ছিন্নভাবে বক্তব্য প্রদান করে যাবেন, যা সংকলন করলে একটি সুসংগত ও অভিন্ন বাণীসমগ্রের রূপ নেবে; যেখানে চিন্তাধারার কোনো সংঘাত থাকবে না, বক্তার মানসিক অস্থিরতার কোনো ছাপ থাকবে না এবং

মতামত বা দৃষ্টিভঙ্গি পরিবর্তনের কোনো চিহ্নও খুঁজে পাওয়া যাবে না।

এক্ষেত্রেও যদি কোনো ব্যতিক্রম থেকে থাকে, তবে তা কেবল এই কুরআন। আর সে কারণেই বলা হয়েছে:

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا.

"তবে কি তারা কুরআন নিয়ে গভীর চিন্তাভাবনা করে না? এটি যদি আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও পক্ষ থেকে হতো, তবে তারা এতে অবশ্যই বহু অসংগতি ও বৈপরীত্য খুঁজে পেত।" (কুরআন, সুরা নিসা, ৪:৮২)

উস্তাদ ইমাম আমিন আহসান ইসলাহি লিখেছেন:

"... কুরআনের প্রতিটি কথা এর মূলনীতি ও শাখা-প্রশাখায় এতটাই সুসংহত ও সুবিন্যস্ত যে, গণিত কিংবা ইউক্লিডীয় জ্যামিতির সূত্রগুলোও ততটা সুসংহত ও সুবিন্যস্ত নয়। কুরআন যেসব আকিদার শিক্ষা দেয়, সেগুলো একে অপরের সঙ্গে এমনভাবে গাঁথা যে, তার মধ্য থেকে কোনো একটিকে আলাদা করলে

পুরো শৃঙ্খলাই ভেঙে পড়বে। কুরআন যেসব ইবাদত ও আনুগত্যের নির্দেশ দেয়, তা আকিদা থেকে এমনভাবে উৎসারিত হয়, যেমনিভাবে কাণ্ড থেকে গজিয়ে ওঠে শাখা-প্রশাখা; আর কুরআন যেসব আমল ও নৈতিকতার তাগিদ দেয়, সেগুলো এর মূলনীতি থেকে এমনভাবে আত্মপ্রকাশ করে, যেমনিভাবে কোনো বস্তু থেকে তার প্রাকৃতিক ও স্বভাবজাত বৈশিষ্ট্য প্রকাশ পায়। কুরআনের সামগ্রিক শিক্ষা থেকে জীবনব্যবস্থার যে রূপ গড়ে ওঠে, তা একটি ‘বুনিয়ানুম মারসুস’ বা সিসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় মূর্ত হয়ে ওঠে; যার প্রতিটি ইট অপরটির সাথে এমনভাবে সংলগ্ন যে, পুরো ইমারতে কোনো শূন্যতা তৈরি না করে সেখান থেকে একটি ইটও বিচ্ছিন্ন করা সম্ভব নয়।” (তাদাব্বুরে কুরআন, ২/৭৪৩)

তৃতীয়ত, মানবজ্ঞান কখনোই পুরোপুরি সত্য বা ভ্রান্তিহীন হতে পারে না; তাতে সত্যের পাশাপাশি সর্বদা কিছু না কিছু মিথ্যার সংমিশ্রণ ঘটেই থাকে। ফলে মানুষ পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে না নিতেই তার জ্ঞান, তথ্য, গবেষণালব্ধ সিদ্ধান্ত, যুক্তি ও অনুমানের ভুলগুলো স্পষ্ট হয়ে উঠতে শুরু করে। সক্রেটিস-প্লেটো বা নিউটন-

আইনস্টাইন— সবার নিয়তি এটি-ই; এই নিয়তি থেকে কারো নিস্তার নেই। জ্ঞান ও সাহিত্যের সমগ্র ইতিহাসে এমন কোনো মানুষের দেখা কোনো যুগে বা স্থানে মেলেনি, যিনি এর ব্যতিক্রম। কিন্তু কুরআন এই ক্ষেত্রেও বিস্ময়কর এক ব্যতিক্রম। আজ প্রায় দেড় হাজার বছর অতিবাহিত হতে চলছে, কুরআন নিরন্তর পরীক্ষার সম্মুখীন; অথচ বড় বড় দার্শনিক, প্রাজ্ঞ ব্যক্তি কিংবা বিজ্ঞানীদের পক্ষেও আজ অবধি সম্ভব হয়নি কুরআনের কোনো কথাকে ভুল কিংবা এর কোনো শিক্ষাকে অসত্য প্রমাণ করা। গত তিন শতাব্দীতে পৃথিবী কোথায় থেকে কোথায় পৌঁছেছে, অথচ এই দীর্ঘ পথচলায় এমন কোনো বাস্তবতা উন্মোচিত হয়নি, যা কুরআনের পেশ করা সত্যের পরিপন্থী। কোনো জ্ঞানই কুরআনে বর্ণিত বাণীর অসারতা প্রমাণ করতে পারেনি। কুরআন মানুষকে কোনো নির্দেশনা দিয়েছে এবং সেই নির্দেশনা যে উদ্দেশ্যেই দিয়ে থাক না কেন, আজ পর্যন্ত এমন কোনো পরীক্ষা বা পর্যবেক্ষণ সাধিত হয়নি, যা কুরআনের দেওয়া নির্দেশনাকে ভুল প্রমাণ করতে পারে। কুরআন যাকে ‘হক’

বলে, তা কখনো মিথ্যা হয়নি; আর যাকে 'বাতিল' বলে ঘোষণা করে, তা কখনো সত্য বলে প্রমাণিত হয়নি। কুরআন সম্পর্কে এই সত্যগুলো সুপ্রতিষ্ঠিত ও অনস্বীকার্য। এ বিষয়ে বলা হয়েছে:

وَإِنَّهُ لَكِتَابٌ عَزِيزٌ ﴿٤١﴾ لَّا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ تَنزِيلٌ مِّنْ حَكِيمٍ حَمِيدٍ ﴿٤٢﴾

"প্রকৃত সত্য এই যে, এটি এক সুউচ্চ মর্যাদার গ্রন্থ। এর সম্মুখ কিংবা পশ্চাৎ—কোনো দিক থেকেই মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করতে পারে না। এটি অবতীর্ণ হয়েছে সেই সত্তার পক্ষ থেকে, যিনি পরম প্রজ্ঞাময় এবং যাবতীয় প্রশংসার অধিকারী।" (কুরআন, হামিম সাজদা, ৪১:৪১-৪২)

এটিই সেই মানদণ্ড, যার ভিত্তিতে নিজের সত্যতা প্রমাণের পর কুরআন মানুষকে অবহিত করেছে: যে মহাবিশ্বকে তোমরা নিজেদের স্রষ্টা মনে করার ভুল করছ, সেটিও তাঁরই সৃষ্টি, যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তোমরা কি দেখছ না যে, এই জগতের প্রতিটি বস্তুই সৃষ্টির সৌন্দর্যের

এক অলৌকিক বহিপ্রকাশ? প্রতিটি জিনিসের মাঝে নিহিত রয়েছে গভীর সার্থকতা, অসাধারণ পরিকল্পনা, প্রজ্ঞা, সুনিপুণ ব্যবস্থাপনা, উপযোগিতা ও বিস্ময়কর নিয়মশৃঙ্খলা। এতে রয়েছে পরম সামঞ্জস্য ও গভীর সমন্বয়; বিদ্যমান অতুলনীয় জ্যামিতিক ও গাণিতিক অনুপাত, যার একমাত্র ব্যাখ্যা কেবল এটিই হতে পারে যে, মহাবিশ্বকেও সেই পরম প্রজ্ঞাবান ও মহাজ্ঞানী সত্তাই সৃষ্টি করেছেন, যিনি সৃষ্টি করেছেন তোমাদের। তিনিই সেই সত্তা, যিনি পৃথিবীকে তোমাদের জন্য শয্যা এবং পর্বতমালাকে পেরেক বানিয়েছেন; তোমাদের সৃষ্টি করেছেন জোড়ায় জোড়ায়; তোমাদের নিদ্রাকে করেছেন শ্রান্তি দূরীকরণের উপায়, আর রাতকে করেছেন আবরণ ও দিনকে জীবিকা অনুসন্ধানের সময়; তোমাদের ঊর্ধ্বে নির্মাণ করেছেন সাতটি সুদৃঢ় আকাশ এবং সেখানে স্থাপন করেছেন এক প্রজ্বলিত প্রদীপ। তিনিই সেই সত্তা, যিনি ঘন মেঘমালা থেকে প্রচুর বারিপাত ঘটান; যেন তা দিয়ে উৎপন্ন করতে পারেন শস্য, উদ্ভিদ ও ঘন সুশোভিত উদ্যান:

هُــوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُــوَ عَالِــمُ الْغَيْــبِ
وَالشَّهَادَةِ هُــوَ الــرَّحْمَٰنُ الــرَّحِيمُ ﴿٢٢﴾ هُــوَ اللَّهُ
الَّذِي لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُــوَ الْمَلِــكُ الْقُــدُّوسُ السَّــلَامُ
الْمُــؤْمِنُ الْمُهَــيْمِنُ الْعَزِيــزُ الْجَبَّــارُ الْمُتَكَــبِّرُ
سُــبْحَانَ اللَّهِ عَمَّــا يُشْرِــكُونَ ﴿٢٣﴾ هُــوَ اللَّهُ
الْخَالِقُ الْبَــارِئُ الْمُصَــوِّرُ لَهُ الْأَسْــمَاءُ الْحُسْــنَىٰ
يُسَبِّحُ لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيــزُ
الْحَكِيمُ ﴿٢٤﴾

“তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি দৃশ্য ও অদৃশ্যের পরিজ্ঞাতা। তিনি পরম করুণাময়, তাঁর মমতা চিরন্তন। তিনিই আল্লাহ, যিনি ছাড়া কোনো উপাস্য নেই; তিনি সার্বভৌম অধিপতি, পরম পবিত্র সত্তা, শান্তি ও নিরাপত্তার আধার, রক্ষক, পরাক্রমশালী, প্রতাপশালী ও চরম শ্রেষ্ঠত্বের অধিকারী। তারা যাদের শরিক সাব্যস্ত করে, আল্লাহ তা থেকে সম্পূর্ণ পবিত্র। তিনিই আল্লাহ: পরিকল্পনাকারী, অস্তিত্বদানকারী ও রূপকার; সকল সুন্দর নাম তাঁরই। আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবীর প্রতিটি বস্তু তাঁরই মহিমা ঘোষণা করে; আর তিনি পরম পরাক্রমশালী ও

প্রজ্ঞাময়।” (কুরআন, সুরা হাশর, ৫৯:২২-২৪)

কুরআন জানিয়ে দিচ্ছে যে, এই স্রষ্টার *রুবুবিয়াত* বা প্রভুত্বের স্বীকৃতি এমন এক মৌলিক বিষয়, যা সৃষ্টির শুরুতেই মানুষের সহজাত প্রকৃতি তথা *ফিতরাতের* গভীরে গেঁথে দেওয়া হয়েছে। কুরআনের বর্ণনা অনুযায়ী এর প্রথম আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল এক আদি অঙ্গীকার ও চুক্তির মাধ্যমে। এই অঙ্গীকারের কথা কুরআন একটি বাস্তব ঘটনা হিসেবে বর্ণনা করে। মানুষকে দুনিয়াতে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে পাঠানো হয়েছে বলে এই ঘটনাটি তার স্মৃতি থেকে মুছে দেওয়া হয়েছে; কিন্তু এর হাকিকত বা আসল বাস্তবতা তার অন্তরের গভীরে অঙ্কিত এবং মস্তিষ্কের গহিনে সুগভীরভাবে প্রোথিত রয়েছে এবং কোনো কিছুই একে মুছে ফেলতে পারে না। ফলে পরিবেশগত কোনো বাধা যদি অন্তরায় না হয় এবং মানুষকে যদি এটি মনে করিয়ে দেওয়া হয়, তবে সে এর দিকে ঠিক সেভাবেই ধাবিত হয়, যেভাবে একটি অবোধ শিশু তার মায়ের দিকে ছুটে যায়, অথচ ঐ শিশু কখনো মাতৃগর্ভ থেকে নিজেকে ভূমিষ্ঠ হতে

দেখেনি। সে এই সুদৃঢ় বিশ্বাসের সাথেই ধাবিত হয়, যেন সে পূর্ব থেকেই স্রষ্টাকে চিনত। সে উপলব্ধি করে: স্রষ্টার এই স্বীকৃতি তার ভেতরের একটি স্বভাবজাত চাহিদার পরম উত্তর, যা তার অন্তরেই বিদ্যমান ছিল। যখন সে তা পেয়ে যায়, তখন তার মনস্তত্ত্বের সকল দাবিও এরই সাথে নিজ নিজ উপযুক্ত স্থান খুঁজে পায়। কুরআনের বক্তব্য হলো, মানুষের অন্তরের এই সাক্ষ্য এতটাই অকাট্য যে, আল্লাহর *রুবুবিয়াত* বা প্রভুত্বের বিষয়ে প্রতিটি মানুষ স্রেফ এই সাক্ষ্যের ভিত্তিতেই আল্লাহর দরবারে জবাবদিহি করতে বাধ্য। কুরআনে বলা হয়েছে:

وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِن بَنِي آدَمَ مِن ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَن تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَٰذَا غَافِلِينَ ﴿١٧٢﴾ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِن قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً مِّن بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ﴿١٧٣﴾ وَكَذَٰلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ وَلَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ ﴿١٧٤﴾

"তাদেরকে সেই সময়ের কথা স্মরণ করিয়ে দেন, যখন আপনার প্রতিপালক বনি আদমের পৃষ্ঠদেশ থেকে তাদের বংশধরদের বের করলেন এবং তাদের নিজেদের ওপরই তাদের সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন: 'আমি কি তোমাদের রব নই?' তারা বলেছিল: 'হ্যাঁ, (আপনিই আমাদের রব), আমরা সে বিষয়ে সাক্ষ্য দিচ্ছি।' তা এ কারণেই করা হয়েছে, যেন কিয়ামতের দিন তোমরা বলতে না পারো যে, 'আমরা তো এ বিষয়ে একেবারেই অনবহিত ছিলাম।' কিংবা এই অজুহাত পেশ করতে না পারো যে, 'আমাদের পূর্বপুরুষেরাই তো পূর্বে শিরক বা অংশীদারিত্বের সূচনা করেছিল, আর আমরা ছিলাম তাদের পরবর্তী বংশধর মাত্র। তবে কি আপনি সেই পথভ্রষ্টদের কৃতকর্মের জন্য আমাদের ধ্বংস করবেন?' আর এভাবেই আমি আমার আয়াতসমূহ বিস্তারিত বর্ণনা করি, যাতে মানুষের ওপর দলিল-প্রমাণ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং তারা যেন ফিরে আসে।" (কুরআন, সুরা আরাফ, ৭:১৭২-১৭৪)

এই স্বীকৃতিই মহাবিশ্বের প্রাণ। মানুষের বুদ্ধি এতে প্রশান্তি লাভ করে এবং তার হৃদয়

পরিণত হয় নুরের উদয়স্থলে। ফলে সে উচ্চকণ্ঠে বলে ওঠে: নিঃসন্দেহে আল্লাহই সেই সত্তা, যাঁর নুরে এই আকাশমণ্ডল ও পৃথিবী আলোকিত:

لَلَّهُ نُورُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ مَثَلُ نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ الْمِصْبَاحُ فِي زُجَاجَةٍ الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِن شَجَرَةٍ مُّبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ لَّا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ نُّورٌ عَلَىٰ نُورٍ يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ وَيَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

“আল্লাহ আসমান ও জমিনের জ্যোতি। (মানুষের অন্তরে) তাঁর এই জ্যোতির উপমা যেন একটি তাকের মতো, যার ভেতরে রয়েছে: একটি প্রদীপ। প্রদীপটি রক্ষিত কাচের এক আবরণের ভেতরে; সেই কাচটি দেখতে এক উজ্জ্বল দীপ্তিময় নক্ষত্রের ন্যায়। সেই প্রদীপটি প্রজ্বলিত করা হয় বরকতময় জলপাই বৃক্ষের তেল দিয়ে, যা না পুবের, আর না পশ্চিমের। তার তেল (এতটাই বিশুদ্ধ ও

স্বচ্ছ যে), মনে হয় আগুন স্পর্শ করার আগেই তা নিজেই জ্বলে উঠবে। জ্যোতির ওপর জ্যোতি! আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তাঁর এই জ্যোতির দিকে পথপ্রদর্শন করেন। আল্লাহ মানুষের (উপলব্ধির) জন্য এসব উপমা পেশ করেন এবং আল্লাহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।” (কুরআন, সুরা নুর, ২৪:৩৫)

উস্তাদ ইমাম লিখেছেন:

“... এই আকাশ ও পৃথিবী, বরং সমগ্র মহাবিশ্ব সেই ব্যক্তির জন্য এক অন্ধকার জগৎ ও আঁধারপুরি, যে আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, কিংবা বিশ্বাস করলেও আল্লাহর গুণাবলি ও সেগুলোর দাবিকে স্বীকার করে না। এমন ব্যক্তি না এটি জানতে পারে যে, পৃথিবী কোথা থেকে এসেছে; আর না এটি বুঝতে পারে যে, এর অস্তিত্বের পেছনের মূল উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য কী। সে নিজের সম্পর্কেও এই ফয়সালা করতে পারে না যে, তার নিজের অস্তিত্বের উদ্দেশ্য কী? সে কি এই দুনিয়ায় সম্পূর্ণ বাঁধনহারা ও স্বেচ্ছাচারী, নাকি কোনো বিধানের অনুগত ও আজ্ঞাবহ? সে কি জবাবদিহিতার ঊর্ধ্বে, নাকি বাধ্য অনুগত?

তার জন্য কোনটি কল্যাণ আর কোনটি অকল্যাণ? তাকে কি জুলুমের পথ অবলম্বন করতে হবে, নাকি ন্যায়ের? সে কি স্রেফ নিজের স্বার্থ ও কামনা-বাসনার অনুসরণ করবে, নাকি সেগুলোর চেয়ে কোনো উচ্চতর পরম লক্ষ্যের পেছনে ছুটবে? এই প্রশ্নগুলোর সঠিক উত্তরের ওপর নির্ভর করে সঠিক ও সফল জীবনের ভিত্তি। কিন্তু যে ব্যক্তি আল্লাহকে বিশ্বাস করে না, সে এই প্রশ্নগুলোর সঠিক সমাধান খুঁজে পায় না। সে অন্ধকারের মাঝে অন্ধের মতো পথ হাতড়ে বেড়ায় এবং শেষমেশ ধ্বংসের অতল গহ্বরে পতিত হয়ে নিজের অশুভ কর্মফল ভোগ করে। পক্ষান্তরে, যে ব্যক্তি আল্লাহকে তাঁর সঠিক গুণাবলি ও বৈশিষ্ট্যের সাথে বিশ্বাস করে, সে এই মহাবিশ্বের আদি উৎসও খুঁজে পায় এবং এর চূড়ান্ত পরিণামও তার কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। তার সামনে উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে সেসব প্রশ্নের উত্তর, যার সমাধান অবিশ্বাসী মানুষ কখনো খুঁজে পায় না। এ কারণে এই পৃথিবী তার জন্য কোনো আঁধারপুরি হয়ে থাকে না; বরং ঈমানের নুরে তার জন্য প্রতিটি বস্তু ঝলমল করে ওঠে এবং জগতের প্রতিটি দিক

তার কাছে আলোকিত হয়। যেদিকে সে পদক্ষেপ নেয়, দিবালোকের স্পষ্টতায় সে ওই পদক্ষেপ নেয়; আর যেদিকেই সে অগ্রসর হয়, আল্লাহর ঈমানের নুর তাকে পথপ্রদর্শন করে। এই বাস্তবতাই উক্ত আয়াতে স্পষ্টভাবে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে এভাবে যে, আসমান ও জমিনের নুর হলেন: আল্লাহ। যার নিকট এই নুর রয়েছে, তিনি আলোতে আছেন এবং রয়েছেন সিরাতুল মুস্তাকিম তথা সোজা পথের ওপর। আর যে ব্যক্তি এই নুর থেকে বঞ্চিত, সে তো ঘোর অন্ধকারে পথ হারিয়ে ফেলেছে, তাকে অন্য কেউ আলো দিতে পারে না:

وَمَن لَّمْ يَجْعَلِ اللَّهُ لَهُ نُورًا فَمَا لَهُ مِن نُّورٍ

(আল্লাহ যাকে নুর দান করেন না, তার জন্য কোনো নুরই নেই)।”

(তাদাব্বুরে কুরআন, ৫/৪০৯)

মূলনীতি ও ভিত্তি

ধর্মকে আমরা যেভাবে উপলব্ধি করেছি, তাতে তিনটি বিষয় মূলনীতি হিসেবে গণ্য:

প্রথমত, কুরআন হলো সত্য ও মিথ্যার মানদণ্ড (মিজান) ও পার্থক্যকারী (ফুরকান) এবং পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাবের জন্য অভিভাবক ও রক্ষক (মুহাইমিন)। কুরআন অবতীর্ণই হয়েছে ধর্ম ও শরিয়তের বিষয়ে মানুষের মধ্যকার যাবতীয় মতভেদের মীমাংসা করার উদ্দেশ্যে, যাতে তারা প্রকৃত সত্যের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। কুরআন তার এই মর্যাদা নিজেই বর্ণনা করেছে। অতএব এর ওপর ভিত্তি করে কুরআন সম্পর্কে মূলনীতি হিসেবে যেসব বিষয় মান্য করা আবশ্যক, তা হলো:

১. কুরআনের মূলপাঠ তথা টেক্সট পুরোপুরি সুনির্ধারিত। কুরআন কেবল তাই, যা

‘মুসহাফে’ লিপিবদ্ধ রয়েছে। এছাড়া পশ্চিমের কিছু এলাকা বাদে বর্তমানে গোটা বিশ্বের মুসলিম উম্মতের সিংহভাগ মানুষ যে কিতাব তিলাওয়াত করে, তাই কুরআন। এই তিলাওয়াত যে কিরাআত অনুযায়ী চর্চিত হয়, তাকে ‘কিরাআতে আম্মা’ বলা হয়। এটি ছাড়া অন্য কোনো কিরাআত কুরআন নয় এবং তাকে কুরআনের সমকক্ষ মর্যাদা দিয়ে উপস্থাপনও করা যাবে না।

২. কুরআন নিজের অর্থ প্রকাশে অকাট্য (কাতিউদ দালালা)। এর অর্থ হচ্ছে: কুরআনের শব্দাবলি এমন পূর্ণ সামর্থ্য রাখে যে, মানুষ যদি এর দিকনির্দেশনা গ্রহণ করতে চায়, তবে কুরআন তাকে অকাট্যভাবে সেই মূল উদ্দেশ্য বা মর্ম পর্যন্ত পৌঁছে দেবে, যার জন্য তা অবতীর্ণ হয়েছে। মানুষ মাঝেমধ্যে কুরআনের মর্ম বুঝতে ব্যর্থ হয়, তা স্রেফ তার নিজের জ্ঞানের সীমাবদ্ধতা ও গবেষণার ঘাটতির ফল; কুরআনের ভাষা কিংবা তার বর্ণনাশৈলীর সাথে এর কোনো সম্পর্ক

নেই। কুরআন নিজের উদ্দেশ্য প্রকাশে কখনোই অক্ষম নয়।

৩. কুরআনের সেসব আয়াতই 'মুহকাম' (সুস্পষ্ট), যেগুলোর ওপরই কুরআনের হেদায়েত নির্ভরশীল। 'মুতাশাবিহাত' (রূপক) হচ্ছে কেবল ওই সকল আয়াত, যেখানে পরকালের নেয়ামত কিংবা শাস্তির রূপক বিবরণ দেওয়া হয়েছে, কিংবা খোদাতায়ালার গুণাবলি ও কার্যাবলি এবং আমাদের জ্ঞান ও পর্যবেক্ষণের অগোচরে থাকা জগৎ সম্পর্কে কোনো কথা রূপক শৈলীতে বর্ণনা করা হয়েছে। এই আয়াতগুলো অনির্ধারিত নয় এবং সেগুলোর মর্মার্থের মধ্যেও কোনো অস্পষ্টতা নেই। এগুলোর শব্দগুলোও 'আরবি মুবিন' তথা সুস্পষ্ট আরবি ভাষারই অংশ এবং এর অর্থ আমরা কোনো দ্বিধা ছাড়াই অনুধাবন করতে পারি। তবে এগুলোর অন্তর্নিহিত হাকিকত বা চূড়ান্ত বাস্তবতা আমরা এই পৃথিবীতে জানতে পারি না। আর যেহেতু এই হাকিকত জানার ওপর কুরআন

বোঝার মূলনীতি নির্ভর করে না, তাই আমরা সেগুলোর কখনো পড়ে থাকি না।

৪. কুরআনের বাইরে অন্য যেকোনো ওহি, তা প্রচ্ছন্ন কিংবা প্রত্যক্ষ যাই হোক না কেন, কুরআনের কোনো বিধানে সামান্যতম পরিবর্তন আনার ক্ষমতা রাখে না। এমনকি যে মহান নবীর ওপর কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে, তিনিও এর কোনো হুকুম বা নির্দেশ পরিবর্তন করতে পারেন না। ধর্মের প্রতিটি বিষয় গ্রহণ বা বর্জনের সিদ্ধান্ত কুরআনের সুস্পষ্ট আয়াতের আলোকে সম্পন্ন হয়। ঈমান ও আকিদার প্রতিটি আলোচনার সূচনা এখান থেকেই হয় এবং এখানেই তার সমাপ্তি ঘটে। যেকোনো ধরনের ওহি, ইলহাম, মনের গহিনের প্রচ্ছন্ন প্রেরণা, গবেষণা কিংবা মতবাদ— সবই এই কুরআনের অনুগত। ইমাম আবু হানিফা ও শাফেয়ি, বুখারি ও মুসলিম, আশআরি ও মাতুরিদি এবং জুনায়েদ ও শিবলি— সকল প্রাজ্ঞ ব্যক্তিত্বের ওপর কুরআনের নিরঙ্কুশ শাসন প্রতিষ্ঠিত; তাদের মত বা গবেষণার

কোনো বিষয় যদি কুরআনের পরিপন্থী হয়, তবে তা কখনোই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

দ্বিতীয়ত, সুন্নাত হলো ইব্রাহিমি ঐতিহ্যের সেই ধারা, যাকে আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) সংস্কার ও পরিমার্জনের পর এবং কিছু সংযোজনসহ নিজের অনুসারীদের মাঝে ধর্ম হিসেবে জারি করেছেন। কুরআনে আল্লাহর রাসুলকে 'মিল্লাতে ইব্রাহিমি'-র অনুসরণের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে; এই ঐতিহ্যও মূলত তারই অংশ। প্রামাণিকতার দিক থেকে সুন্নাত ও কুরআন মাজিদের মধ্যে কোনো পার্থক্য নেই। কুরআন মাজিদ যেভাবে সাহাবিদের *ইজমা* (ঐকমত্য) ও 'মৌখিক তাওয়াতুর' (বাচনিক নিরবচ্ছিন্ন ধারা)-এর মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত পৌঁছেছে, সুন্নাতও ঠিক সেভাবে সাহাবিদের *ইজমা* ও 'ব্যবহারিক তাওয়াতুর' (কর্মগত নিরবচ্ছিন্ন ধারা)-এর মাধ্যমে আমাদের পর্যন্ত এসেছে। কুরআনের মতোই সুন্নাত প্রতিটি যুগে সমগ্র মুসলিম উম্মতের *ইজমা* দ্বারা সুপ্রমাণিত। সুতরাং এ নিয়ে কোনো বিতর্ক বা দ্বিমতের অবকাশ নেই।

তৃতীয়ত, ধর্ম কেবল সেটিই, যা কুরআন ও সুন্নাতে বর্ণিত হয়েছে। এগুলো অন্যকিছুই ধর্ম নয় এবং সেগুলোকে ধর্ম হিসেবে গণ্যও করা যাবে না। আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর বাণী, কর্ম এবং মৌনসম্মতির বিবরণ সংবলিত 'আখবারে আহাদ' তথা একক সূত্রের বর্ণনা দ্বারা ধর্মের মূল আকিদা বা আমলে নতুন কোনো বিষয়ের সংযোজন ঘটে না। 'আখবারে আহাদ' তথা একক সূত্রের বর্ণনাকে সাধারণ হাদিস বলা হয়। ধর্মসংক্রান্ত যে বিষয়গুলো হাদিসে বর্ণিত হয়েছে, সেগুলো প্রকৃতপক্ষে কুরআন ও সুন্নাতের ওপর প্রতির্ষ্ঠিত ধর্মেরই ব্যাখ্যা ও বিশ্লেষণ এবং ধর্মের পালনের ক্ষেত্রে আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর উত্তম আদর্শের রূপরেখা মাত্র। হাদিসের পরিধি কেবল এতটুকুই। সুতরাং ধর্মীয় বিধান হিসেবে এই পরিধির বাহিরের কোনো বিষয় হাদিস থেকে সাব্যস্ত হতে পারে না এবং কেবল হাদিসের ভিত্তিতে তা স্বাধীন ধর্ম হিসেবে গ্রহণও করা যাবে না। তবে এই পরিধির ভেতরে হাদিসের প্রামাণিকতা সেই ব্যক্তির ওপর প্রতির্ষ্ঠিত হয়, যিনি এর বিশুদ্ধতা সম্পর্কে

নিশ্চিত হওয়ার পর তা আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর বাণী, কর্ম কিংবা মৌনসম্মতি হিসেবে গ্রহণ করেন। তখন তা থেকে বিচ্যুত হওয়া তার জন্য আর বৈধ থাকে না; বরং তার জন্য অপরিহার্য হয়ে পড়ে: আল্লাহর রাসুলের কোনো হুকুম বা ফয়সালা যদি ওই হাদিসে বর্ণিত হয়ে থাকে, তবে তার সামনে বিনম্র চিত্তে মাথা নত করে দেওয়া।

সত্য ধর্ম

ধর্মের মূল সত্যকে যদি একটি শব্দে প্রকাশ করা হয়, তবে কুরআনের পরিভাষায় তা হলো: আল্লাহর ‘ইবাদত’। বিশ্বজগতের প্রতিপালক এই জগতে তাঁর বান্দাদের কাছে কেবল তাঁর ইবাদত-ই কামনা করেন। তিনি ঘোষণা করেন:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ.

“আমি জিন ও মানুষকে কেবল এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে, তারা আমার ইবাদত করবে।” (সুরা জারিয়াত, ৫১:৫৬)

কুরআন মাজিদের বিভিন্ন স্থানে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, আল্লাহতায়ালা মানুষকে এই পরম সত্য সম্পর্কে সচেতন করার উদ্দেশ্যেই তাঁর নবী ও রাসুলগণকে প্রেরণ করেছেন:

وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ.

"আমরা প্রতিটি উম্মতের মধ্যেই একজন করে রাসুল এই আহ্বানসহ প্রেরণ করেছি যে, 'তোমরা আল্লাহর ইবাদত করো এবং তাগুত থেকে বেঁচে থাক'।" (সুরা নাহল, ১৬:৩৬)

এই 'ইবাদত'-এর প্রকৃত অর্থ কী? গভীর মনোযোগ দিলে সুরা নাহলের এই আয়াত থেকেই তা সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে। আল্লাহর ইবাদতের বিপরীতে এখানে তাগুতের অনুসরণ থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। কুরআনে الطَّاغُوْت 'আত-তাগুত' ও الشَّيْطَان 'আশ-শাইতান' সমার্থক পরিভাষা হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে; অর্থাৎ যা আল্লাহর সামনে অবাধ্যতা, বিদ্রোহ ও অহংকার প্রদর্শন করে। এর বিপরীত রূপটি যে স্রেফ বিনয় ও নম্রতা, তা সুস্পষ্ট। এই কারণে অভিধানবিদ ইমামগণ সাধারণত ইবাদতের অর্থ এভাবে করেন: أَصْلُ

الْعَبُودِيَّةِ الْخُضُوعُ وَالتَّذَلُّلُ (*ইবাদত মূলত চরম বিনয় ও নম্রতা*)[৯]।

ইবাদত যদি আল্লাহর রহমত, কুদরত, রুবুবিয়াত (প্রতিপালন) ও প্রজ্ঞার সঠিক উপলব্ধির সাথে বিকশিত হয়, তবে তা পরম ভালোবাসা ও পরম ভয়ের সাথে আল্লাহর সামনে শেষ সীমা পর্যন্ত নিজেকে অবনত করার রূপ ধারণ করে। خُشُوْع (*খুশু: আত্মিক বিনয়*), خُضُوْع (*খুজু: শারীরিক নম্রতা*), إِخْبَات (*ইখবাত: পরম অবনতি*), إِنَابَة (*ইনাবাত: রবের পানে প্রত্যাবর্তন*), خَشْيَة (*খাশইয়াত: ঐশ্বরিক ভীতি*), تَضَرُّع (*তাযাররু: কাতর প্রার্থনা*) ও قُنُوْت (*কুনুত: একনিষ্ঠ আনুগত্য*)— এই শব্দগুলো কুরআনে এই আধ্যাত্মিক সত্যকে প্রকাশ করতে ব্যবহৃত হয়েছে। ইবাদত মূলত এক অভ্যন্তরীণ চেতনা, যা মানুষের অন্তরে প্রস্ফুটিত হয় এবং তার অস্তিত্বের গহিন তলদেশকে আচ্ছন্ন করে। আল্লাহর জিকির, তাঁর শোকর, তাঁর অসন্তুষ্টির ভয়, তাঁর সাথে ইখলাস বজায় রাখা তথা

[৯] লিসানুল আরব, ৯/১০।

একনিষ্ঠ হওয়া, তাঁর ওপর ভরসা করা এবং তাঁর দরবারে নিজেকে সমর্পন করা ও তাঁর ফয়সালায় সন্তুষ্ট থাকা— এগুলোই বান্দা ও মাবুদের মধ্যকার সুগভীর সম্পর্কেরই আত্মিক প্রকাশ। এর সার কথা হচ্ছে: বান্দা এই সম্পর্কের মাঝে নিজ প্রতিপালকের স্মরণে অন্তরে প্রশান্তি লাভ করে, তাঁর অশেষ অনুগ্রহের সামনে নিজের ভেতর কৃতজ্ঞতার অনুভূতিকে প্রবল প্লাবনের মতো উথলে উঠতে দেখে, তাঁর অসন্তুষ্টিকে ভয় করে, কেবল তাঁরই অনুগত হয়ে থাকে, তাঁরই ওপর ভরসা রেখে পথ চলে, নিজের প্রতিটি বিষয় তাঁর দরবারে সোপর্দ করে এবং নিজের সমগ্র অস্তিত্বকে তাঁর কাছে সমর্পণ করে এবং তাঁর প্রতিটি সিদ্ধান্তে পরম সন্তুষ্ট থাকে। মানুষের বাহ্যিক জীবনে এই আধ্যাত্মিক সম্পর্কের প্রকাশ যেসকল রূপে ঘটে, সে বিষয়ে কুরআনের মূল বক্তব্য:

إِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا
سُجَّدًا وَسَبَّحُوا بِحَمْدِ رَبِّهِمْ وَهُمْ لَا
يَسْتَكْبِرُونَ ۩ ﴿١٥﴾ تَتَجَافَىٰ جُنُوبُهُمْ عَنِ

الْمَضَاجِعِ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ خَوْفًا وَطَمَعًا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِقُونَ ﴿١٦﴾

"আমাদের আয়াতসমূহের ওপর কেবল তারাই ঈমান আনে, (হে নবী!) যখন তাদেরকে এর মাধ্যমে উপদেশ প্রদান করা হয়, তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং নিজেদের রবের প্রশংসার সাথে তাঁর তাসবিহ পাঠ করে; আর তারা কখনোই অহংকার করে না। তাদের পার্শ্বদেশ শয্যা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকে; তারা ভয় ও আশার সাথে তাদের রবকে আহ্বান করে এবং আমরা তাদেরকে যে রিজিক দান করেছি, তা থেকে তারা ব্যয় করে।" (কুরআন, সুরা সাজদা, ৩২:১৫-১৬)

এই রুকু ও সেজদা, *তাসবিহ* (আল্লাহর মাহাত্ম্য ঘোষণা) ও *তাহমিদ* (আল্লাহর পরম গুণকীর্তন), দোয়া ও মোনাজাত এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যে জান ও মালের কুরবানি, মূলত এগুলোই আসল 'ইবাদত'। কিন্তু মানুষ এই জগতে একটি কর্মমুখর জীবনও যাপন করে; তাই ইবাদত কেবল আচার-অনুষ্ঠানের বাহ্যিক গণ্ডির ভেতরেই আবদ্ধ থাকে না, বরং মানুষের সেই কর্মময় জীবনের সাথেও

ওতপ্রোতভাবে যুক্ত হয় এবং উপাসনার পাশাপাশি পূর্ণ আনুগত্যকেও নিজের অন্তর্ভুক্ত করে নেয়। তখন তা মানুষের কাছে এই দাবি পেশ করে যে, তার *বাতেন* (অভ্যন্তরীণ সত্তা) যে পরম সত্তার সামনে অবনত হয়েছে, তার *জাহের* (বাহ্যিক সত্তা)-ও যেন কেবল তাঁরই সামনে অবনত হয়। সে নিজেকে অন্তরের দিক থেকে যাঁর কাছে সমর্পণ করেছে, তার জীবনসংগ্রামে ও বস্তুগত জগতেও যেন কেবল তাঁরই বিধান কার্যকর থাকে, এমনকি তার জীবনের কোনো একটি দিকও যেন এর আওতামুক্ত না হয়। অন্য কথায়, জীবনের প্রতিটি আঙিনাতেই সে যেন একনিষ্ঠভাবে তার প্রতিপালকের বান্দা হয়ে ওঠে। সে বিষয়েই বলা হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ارْكَعُوا وَاسْجُدُوا وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

“হে ঈমানদারগণ! (এদের যুগ শেষ হয়েছে, এখন তোমাদের যুগ শুরু হচ্ছে; সুতরাং) তোমরা রুকু ও সেজদা করো, তোমাদের প্রতিপালকের ইবাদত করো এবং সৎকর্ম

করো, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।” (কুরআন, সুরা হজ্জ, ২২:৭৭)

আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার প্রভু-ভৃত্যের এই সম্পর্কের জন্য ‘ইবাদত’ যখন আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি নির্ধারণ করে, আচার-অনুষ্ঠান স্থির করে এবং জগতে এই সম্পর্কের দাবি পূরণের জন্য সীমারেখা ও নিয়মকানুন নির্দিষ্ট করে, তখন কুরআনের ভাষায় তাকে ‘দীন’ বা ধর্ম বলা হয়। এর যে রূপটি আল্লাহতায়ালা তাঁর নবী ও রাসুলগণের মাধ্যমে মানবজাতির কাছে সুস্পষ্ট করেছেন, কুরআন তাকে ‘আদ-দীন’ (*একমাত্র সত্য ধর্ম*) হিসেবে আখ্যায়িত করে এবং এই ধর্ম সম্পর্কে মানুষকে এই হেদায়েত প্রদান করে যে, তারা যেন একে একদম সঠিকভাবে ও নিজেদের জীবনে পুরোপুরি কায়েম রাখে এবং এতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি না করে। সুরা শুরায় বর্ণিত হয়েছে:

شَرَعَ لَكُم مِّنَ الدِّينِ مَا وَصَّىٰ بِهِ نُوحًا وَالَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ وَمَا وَصَّيْنَا بِهِ إِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ أَنْ أَقِيمُوا الدِّينَ وَلَا تَتَفَرَّقُوا فِيهِ.

"তিনি তোমাদের জন্য সেই ধর্মকে নির্ধারণ করেছেন, যার নির্দেশ তিনি দিয়েছিলেন নুহকে এবং (হে নবী!) যার ওহি আমরা তোমার নিকট প্রেরণ করেছি এবং যার নির্দেশ আমরা দিয়েছি ইব্রাহিম, মুসা ও ঈসাকে এই বলে যে: 'তোমরা (নিজেদের জীবনে) এই ধর্মকে সুপ্রতিষ্ঠিত রাখ[১০] এবং এতে কোনো বিভেদ সৃষ্টি করো না'।" (কুরআন, সুরা শুরা, ৪২:১৩)

এই ইবাদতের জন্য যেসব আধ্যাত্মিক ও নৈতিক ভিত্তি আল্লাহর এই ধর্মে বর্ণিত হয়েছে, কুরআন সেগুলোকে 'আল-হিকমা' এবং এর আচার-অনুষ্ঠান ও সীমারেখাকে 'আল-কিতাব' (অর্থাৎ আইন-কানুন) নামে অভিহিত করে:

وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُن تَعْلَمُ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا.

১০ অর্থাৎ যেকোনো অবস্থায় এর ওপর অবিচল থাক। 'ইকামতে দীন'-এর সঠিক অর্থ এটিই। বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন, আমাদের 'বুরহান' বইয়ের প্রবন্ধ: 'ব্যাখ্যার ভ্রান্তি'।

“আল্লাহ তোমার ওপর কিতাব (আইন-কানুন) ও হিকমা অবতীর্ণ করেছেন এবং তোমাকে তা শিখিয়েছেন, যা তুমি জানতে না; আর তোমার ওপর আল্লাহর অনুগ্রহ অত্যন্ত সুমহান।” (কুরআন, সুরা নিসা, ৪:১১৩)

وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ.

“এবং নিজেদের ওপর আল্লাহর অনুগ্রহকে স্মরণ করো, আর স্মরণ করো সেই কিতাব ও হিকমাকে, যা তিনি তোমাদের ওপর অবতীর্ণ করেছেন, যার মাধ্যমে তিনি তোমাদের উপদেশ প্রদান করেন; আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক এবং ভালোভাবে জেনে রাখ: আল্লাহ প্রতিটি বিষয় সম্পর্কে সম্যক অবগত।” (কুরআন, সুরা বাকারা, ২:২৩১)

এই ‘আল-কিতাব’-কে তিনি ‘শরিয়ত’ হিসেবেও অভিহিত করেছেন:

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ.

"অতঃপর (হে নবী!), আমরা তোমাকে ধর্মের এক সুস্পষ্ট শরিয়তের ওপর প্রতিষ্ঠিত করেছি; অতএব তুমি তারই অনুসরণ করো এবং অজ্ঞদের খেয়াল-খুশির পেছনে চলো না।" (কুরআন, সুরা জাসিয়া, ৪৫:১৮)

'আল-হিকমা' সর্বদাই অভিন্ন ও অপরিবর্তনীয় ছিল, কিন্তু 'শরিয়ত' নানাবিধ কারণে ক্ষেত্রবিশেষে ভিন্ন থেকেছে। যেমনটি বলা হয়েছে:

لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً.

"তোমাদের প্রত্যেকের জন্যই আমরা একটি শরিয়ত অর্থাৎ সুনির্দিষ্ট কর্মপন্থা নির্ধারণ করেছি। আল্লাহ চাইলে তোমাদেরকে একই উম্মত বানাতে পারতেন।" (কুরআন, সুরা মায়েদা, ৫:৪৮)

আসমানি বা ঐশী শাস্ত্র অধ্যয়ন করলে জানা যায় যে, তাওরাতে প্রধানত শরিয়ত এবং ইনজিলে হিকমা বর্ণিত হয়েছে। যাবুর হলো এই হিকমার মুখবন্ধস্বরূপ আল্লাহ-তায়ালার মহিমা-কীর্তনের গীত; আর কুরআন এই উভয়ের সমাহারে এক পূর্ণাঙ্গ ও সর্বাত্মক সাহিত্যকর্ম, যা সতর্কবাণী ও সুসংবাদ সংবলিত কিতাব হিসেবে অবতীর্ণ হয়েছে। বাকারা ও নিসার যেসব আয়াত উপরে উদ্ধৃত হয়েছে, সেগুলোতে কুরআন সম্পর্কিত এই সত্য অত্যন্ত স্পষ্ট ভাষায় বর্ণিত হয়েছে। তাওরাত ও ইনজিল সম্পর্কে বলতে গিয়ে আল্লাহতায়ালা কিয়ামতের দিনে সাইয়্যিদুনা ঈসা মসিহ (*আলাইহিস সালাম*)-এর সাথে তাঁর একটি কথোপকথন উল্লেখ করে বলেন:

وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنجِيلَ.

"এবং সেই সময়ের কথা, যখন আমি তোমাকে আইন ও হিকমা শিখিয়েছিলাম অর্থাৎ তাওরাত ও ইনজিলের শিক্ষা

দিয়েছিলাম।” (কুরআন, সুরা মায়েদা, ৫:১১০)

আল-হিকমা পরিভাষা যেসব আলোচনার জন্য গ্রহণ করা হয়েছে, তা মূলত দুটি:

১. ঈমানের বিষয়াবলি,

২. নৈতিকতা।

আল-কিতাব-এর অধীনে যেসব বিষয় বর্ণিত হয়েছে, তা হলো:

১. ইবাদত বিষয়ক আইন, ২. সামাজিক আইন, ৩. রাজনৈতিক আইন, ৪. অর্থনৈতিক আইন, ৫. দাওয়াত সংক্রান্ত আইন, ৬. জিহাদ সংক্রান্ত আইন, ৭. দণ্ডবিধি ও শাস্তি, ৮. পানাহার সংক্রান্ত বিধি, ৯. রীতিনীতি ও আদব-কায়দা, ১০. কসম এবং কসমের কাফফারা।

এগুলোই পুরো ধর্ম। আল্লাহর যেসকল নবী এই ধর্ম নিয়ে এসেছিলেন, তাদেরকে ‘নবী’ বলা হয়। কুরআন থেকে জানা যায় যে, তাদের মধ্যে কেউ কেউ ‘নবুয়ত’-এর সাথে ‘রিসালাত’-এর মর্যাদাতেও অধিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

'নবুয়ত' হলো: মানুষের মধ্য থেকে কোনো ব্যক্তি আসমান থেকে ওহি লাভ করে মানুষকে সত্য জানাবেন এবং তার অনুসারীদেরকে কিয়ামতের দিনের উত্তম পরিণামের সুসংবাদ দেবেন ও অমান্যকারীদেরকে খারাপ পরিণাম সম্পর্কে সতর্ক করবেন। কুরআন একে إِنْذَار (*ইনজার: সতর্ক করা*) এবং بَشَارَة (*বাশারাত: সুসংবাদ দেওয়া*) দ্বারা প্রকাশ করে:

كَانَ النَّـاسُ أُمَّـةً وَاحِـدَةً فَبَعَـثَ اللَّهُ النَّبِيِّـينَ مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ.

"মানুষ একই উম্মত ছিল। তারপর (তাদের মধ্যে মতভেদ দেখা দিলে) আল্লাহ নবী পাঠালেন সুসংবাদ দিতে এবং সতর্ক করতে।" (কুরআন, সুরা বাকারা, ২:২১৩)

'রিসালাত' হলো: নবুয়তের মসনদে অধিষ্ঠিত কোনো ব্যক্তি নিজের জাতির জন্য এমনভাবে খোদাতায়ালার আদালত হয়ে আসেন যে, তার জাতি যদি তাকে অস্বীকার করে, তবে খোদার ফয়সালা এই দুনিয়াতেই তাদের ওপর কার্যকর করেন এবং এভাবেই

তিনি কার্যত ওই জাতির ওপর সত্যের বিজয় প্রতিষ্ঠিত করেন:

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ رَّسُولٌ فَإِذَا جَاءَ رَسُولُهُمْ قُضِيَ بَيْنَهُم بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ.

"(তাঁর আইন এটিই যে) প্রতিটি জাতির জন্য একজন রাসুল রয়েছে। তারপর যখন তাদের রাসুল চলে আসে, তখন তাদের মাঝে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করা হয় এবং তাদের ওপর কোনো জুলুম করা হয় না।" (কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০:৪৭)

إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ فِي الْأَذَلِّينَ ﴿٢٠﴾ كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴿٢١﴾

"(তোমাদের জানা উচিত যে) যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের সাথে শত্রুতা করবে, তারাই সর্বাধিক লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত হবে। কারণ আল্লাহ লিখে রেখেছেন যে, 'আমি ও আমার রাসুলগণ বিজয়ী হয়েই ছাড়ব।' সত্য এটিই যে, আল্লাহ মহাশক্তিমান, পরম

পরাক্রমশালী।” (কুরআন, সুরা মুজাদালা, ৫৮:২০-২১)

রিসালাতের এই আইন অনুসারেই বিশেষভাবে নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) সম্পর্কে কুরআনের বক্তব্য:

هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَىٰ وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ.

“তিনিই সেই সত্তা, যিনি তাঁর রাসুলকে হেদায়েত ও সত্য ধর্মসহ পাঠিয়েছেন, যাতে (এই ভূখণ্ডের) সমস্ত ধর্মের ওপর তাকে বিজয়ী করেন, যদিও মুশরিকরা তা যতই অপছন্দ করুক না কেন।” (কুরআন, সুরা সফ, ৬১:৯)

রিসালাতের বহিঃপ্রকাশ যেভাবে ঘটে, সেটির প্রকৃতি এমন যে, আল্লাহতায়ালা এই রাসুলদেরকে নিজের পুরস্কার ও শাস্তির প্রকাশস্থল হিসেবে মনোনীত করেন এবং তাদের মাধ্যমে কিয়ামতের আগেই একটি ‘ছোট কিয়ামত’ এই দুনিয়াতেই ঘটিয়ে দেখান। রাসুলদেরকে জানিয়ে দেওয়া হয় যে, তারা যদি খোদার সাথে নিজেদের অঙ্গীকারে অটল

থাকেন, তবে তার পুরস্কার এবং অঙ্গীকার থেকে বিচ্যুত হলে তার শাস্তি তারা দুনিয়াতেই পাবেন। এর ফল এটি দাঁড়ায় যে, রাসুলদের অস্তিত্ব মানুষের জন্য খোদার নিদর্শনে পরিণত হয় এবং মানুষ যেন রাসুলের সাথে খোদাকেই জমিনে চলাফেরা করতে এবং বিচার-আচার করতে দেখতে পায়। এর পাশাপাশি রাসুলদেরকে আদেশ দেওয়া হয়, যে সত্যকে তারা চর্মচক্ষে দেখেছেন, সেটির প্রচার করেন এবং আল্লাহতায়ালার হেদায়েত কোনো কমবেশি ছাড়াই এবং পূর্ণ অকাট্যতার সাথে মানুষের কাছে পৌঁছে দেন। কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী এটি 'শাহাদাত'। শাহাদাত যখন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন দুনিয়া ও আখিরাত— উভয় ক্ষেত্রেই এটি খোদায়ি ফয়সালার ভিত্তিতে পরিণত হয়। সুতরাং আল্লাহতায়ালা এই রাসুলদেরকে বিজয় দান করেন এবং তাদের দাওয়াতের অস্বীকারকারীদের ওপর নিজের আজাব নাজিল করেন। এরই ভিত্তিতে কুরআন মাজিদে নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-কে 'শাহিদ' এবং 'শহিদ' বলা হয়েছে। কুরআন বলছে:

إِنَّا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا شَاهِدًا عَلَيْكُمْ كَمَا أَرْسَلْنَا إِلَىٰ فِرْعَوْنَ رَسُولًا.

"(হে কুরাইশগণ!) তোমাদের নিকট আমরা ঠিক সেভাবেই একজন রাসুলকে তোমাদের ওপর সাক্ষী বানিয়ে পাঠিয়েছি, যেভাবে আমরা ফেরাউনের দিকে একজন রাসুল পাঠিয়েছিলাম।" (কুরআন, সুরা মুযযামমিল, ৭৩:১৫)

শাহাদাতের এই মর্যাদা রাসুলগণ ছাড়া সাইয়্যিদুনা ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*)-এর বংশধরদেরকেও দান করা হয়েছিল। কুরআন এরই ভিত্তিতে তাদেরকে আল্লাহর রাসুল এবং তাঁর বান্দাদের মাঝখানে একটি দল أُمَّةً وَّسَطًا 'উম্মতে ওয়াসাত'[১১] বলে আখ্যায়িত করেছে এবং জানিয়েছে যে, এই মর্যাদার জন্য তাদেরকে ঠিক সেভাবেই মনোনীত করা হয়েছে, যেভাবে মানুষের মধ্য থেকে আল্লাহতায়ালা কিছু মহান ব্যক্তিকে নবুয়ত ও রিসালাতের জন্য মনোনীত করেন। বলা হয়েছে:

[১১] কুরআন, সুরা বাকারা, ২:১৪৩।

وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ مِّلَّةَ أَبِيكُمْ إِبْرَاهِيمَ هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِن قَبْلُ وَفِي هَٰذَا لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ.

“এবং (এছাড়াও নিজের মসনদের দায়িত্ব পালনের জন্য) আল্লাহর পথে সংগ্রাম করো, যেভাবে সংগ্রাম করা উচিত। তিনি তোমাদের বেছে নিয়েছেন এবং (যে) শরিয়ত (তোমাদের দান করেছেন, তাতে) তোমাদের ওপর কোনো সংকীর্ণতা রাখেননি। তোমাদের পিতা ইব্রাহিমের মিল্লাতকে তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন। তিনিই তোমাদের নাম ‘মুসলিম’ রেখেছেন ইতোপূর্বে এবং এই কুরআনেও (তোমাদের নাম মুসলিম)। এই নাম এজন্যই বেছে নিয়েছেন যে, রাসুল যেন তোমাদের ওপর (এই ধর্মের) সাক্ষ্য প্রদান করেন এবং তোমরা যেন দুনিয়ার সমস্ত মানুষের ওপর (এর) সাক্ষ্যদাতা হও।” (কুরআন, সুরা হজ্জ, ২২:৭৮)

নবী ও রাসুলগণের সাথে আল্লাহতায়ালা সাধারণত নিজের কিতাবসমূহও নাজিল করেছেন। এগুলোর নাজিল হওয়ার উদ্দেশ্য কুরআন মাজিদে এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এগুলো যেন সত্য ও মিথ্যার মধ্যে মানদণ্ড তথা *মিজান* হিসেবে বিবেচিত হয়, যাতে এগুলোর মাধ্যমে মানুষ নিজেদের মতভেদের মীমাংসা করতে পারে এবং এভাবে সত্যের ব্যাপারে সঠিক ন্যায়বিচারের ওপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। বলা হয়েছে:

وَأَنزَلَ مَعَهُمُ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِيَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.

“এবং তাদের সাথে চূড়ান্ত মীমাংসাস্বরূপ নিজের কিতাব নাজিল করেছেন, যাতে তা মানুষের মধ্যে তাদের মতভেদের ফয়সালা করে দেয়।” (কুরআন, সুরা বাকারা, ২:২১৩)

وَأَنزَلْنَا مَعَهُمُ الْكِتَابَ وَالْمِيزَانَ لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْقِسْطِ.

“এবং তাদের সাথে নিজের কিতাব অর্থাৎ মিজান (মানদণ্ড) নাজিল করেছেন, যাতে মানুষ (সত্য ও মিথ্যার ব্যাপারে) সঠিক ন্যায়বিচারের ওপর কায়েম থাকে।” (কুরআন, সুরা হাদিদ, ৫৭:২৫)

নবুয়ত ও রিসালাতের এই ধারা আদম (*আলাইহিস সালাম*) থেকে শুরু হয়ে আল্লাহর রাসুল মুহাম্মদ (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) পর্যন্ত এসে সমাপ্ত হয়েছে। তার দুনিয়া থেকে বিদায় নেওয়ার পর ওহি ও *ইলহাম* তথা খোদায়ি অনুপ্রেরণার দরজা চিরতরে বন্ধ হয়ে গেছে এবং নবুয়তকে সমাপ্ত করে দেওয়া হয়েছে।[১২] সুতরাং মানুষকে ধর্মের ওপর প্রতিষ্ঠিত রাখার জন্য ‘ইনজার’ তথা সতর্কীকরণের দায়িত্ব এখন কিয়ামত পর্যন্ত এই উম্মতের আলেম সমাজ পালন করবেন। আলেমদের এই দায়িত্ব সুরা তওবায় এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

[১২] কুরআন, সুরা আহযাব, ৩৩:৪০।

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ.

"সব মুসলমানের পক্ষে তো একযোগে বেরিয়ে পড়া সম্ভব ছিল না; কিন্তু এমনটি কেন হলো না যে, তাদের প্রতিটি দল থেকে কিছু লোক বের হবে, যাতে তারা ধর্মের গভীর জ্ঞান অর্জন করে এবং নিজেদের মানুষের কাছে ফিরে এসে (তাদের এসব আচরণের ব্যাপারে) সতর্ক করে, যেন তারা আল্লাহর পাকড়াও থেকে বেঁচে থাকতে পারে?" (কুরআন, সুরা তওবা, ৯:১২২)

এই *ইনজারের* জন্য আল্লাহতায়ালার হেদায়েত হলো: তা কুরআনের মাধ্যমে হতে হবে। [১৩] فَذَكِّرْ بِالْقُرْاٰنِ مَنْ يَّخَافُ وَعِيْدِ এবং

[১৩] কুরআন, সুরা কাফ, ৫০:৪৫। "সুতরাং কুরআনের মাধ্যমে তাকে স্মরণ করাও, যে কিনা আমার শাস্তির ভয় করে।"

جَاہِدْہُمْ بِہٖ جِہَادًا كَبِيْرًا[১৪]— এসব বাক্যে কুরআন এরই নির্দেশ দিয়েছে। আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) এই কারণেই সমগ্র জগতের জন্য ‘নাজির’ (সতর্ককারী); আর আলেমগণ মূলত তারই এই ইনজারকে মানুষের কাছে পৌঁছে দেন: تَبٰرَكَ الَّذِىْ نَزَّلَ الْفُرْقَانَ عَلٰى عَبْدِهٖ لِيَكُوْنَ لِلْعٰلَمِيْنَ نَذِيْرًا[১৫]। তাই বলা হয়েছে:

وَأُوحِيَ إِلَيَّ هَٰذَا الْقُرْآنُ لِأُنذِرَكُم بِهِ وَمَن بَلَغَ.

> “এবং আমার প্রতি এই কুরআন এজন্যই ওহি করা হয়েছে, যেন এর মাধ্যমে আমি তোমাদেরকে সতর্ক করতে পারি এবং তাদেরকেও, যাদের কাছে এটি পৌঁছাবে।” (কুরআন, সুরা আনআম, ৬:১৯)

---

[১৪] কুরআন, সুরা ফুরকান, ২৫:৫২। “এই (কুরআনের) মাধ্যমে এদের বিরুদ্ধে মহাসংগ্রাম চালিয়ে যাও।”

[১৫] কুরআন, সুরা ফুরকান, ২৫:১। “পরম বরকতময়, অত্যন্ত কল্যাণময় সেই সত্তা, যিনি তাঁর বান্দার ওপর এই ফুরকান (পার্থক্যকারী) অবতীর্ণ করেছেন, যাতে তিনি বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারেন।”

এই ধর্মের নাম ‘ইসলাম’ এবং এর সম্পর্কে আল্লাহতায়ালা তাঁর কিতাবে বলেছেন যে, তিনি মানুষের থেকে ইসলাম ব্যতীত অন্য কোনো ধর্ম কখনোই গ্রহণ করবেন না:

إِنَّ الدِّينَ عِندَ اللَّهِ الْإِسْلَامُ ... وَمَن يَبْتَغِ غَـيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْـهُ وَهُـوَ فِي الْآخِـرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.

“আল্লাহর নিকট ধর্ম কেবলই ‘ইসলাম’ ... এবং যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য কোনো ধর্ম গ্রহণ করতে চাইবে, তার থেকে তা কখনোই গ্রহণ করা হবে না এবং আখিরাতে সে ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে।” (কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১৯, ৮৫)

‘ইসলাম’ শব্দটি যেভাবে পুরো ধর্মের জন্য ব্যবহৃত হয়, ঠিক তেমনই ধর্মের বাহ্যিক রূপকেও কখনো কখনো এই ‘ইসলাম’ শব্দ দিয়েই প্রকাশ করা হয়। নিজের এই বাহ্যিক দিক থেকে তা পাঁচটি বিষয় নিয়ে গঠিত:

১। এই সাক্ষ্য দেওয়া যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ *সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম* তাঁর রাসুল,

২। নামাজ কায়েম করা,

৩। যাকাত আদায় করা,

৪। রমজানের রোজা রাখা,

৫। *বাইতুল হারাম* তথা কাবাঘরের হজ্জ করা।

কুরআন মাজিদ বিভিন্ন জায়গায় এগুলোর তাগিদ দিয়েছে। আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর একটি হাদিসে এগুলো এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

الإسلام أن تشهد أن لا إلٰه إلا الله وأن محمدًا رسـول الله، وتقـيم الصـلٰوة، وتـؤتي الزكٰـوة، وتصوم رمضان، و تحج البيت.

"ইসলাম হলো তুমি এই কথা সাক্ষ্য দেবে যে, আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই এবং মুহাম্মদ (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) তাঁর রাসুল; নামাজ কায়েম করবে, যাকাত আদায় করবে, রমজানের রোজা রাখবে এবং বায়তুল

হারামের হজ্জ আদায় করবে।" (মুসলিম, রেওয়ায়েত নম্বর: ৯৩)

ধর্মের অভ্যন্তরীণ সত্তা হলো 'ঈমান'। কুরআনে এর যে বিবরণ দেওয়া হয়েছে, সেই অনুযায়ী এটিও পাঁচটি বিষয়ের সমন্বয়ে গঠিত:

১. আল্লাহর ওপর ঈমান

২. ফেরেশতাদের ওপর ঈমান

৩. নবীগণের ওপর ঈমান

৪. কিতাবসমূহের ওপর ঈমান

৫. প্রতিফল দিবসের ওপর ঈমান

সুরা বাকারাতে রয়েছে:

آمَنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْهِ مِن رَّبِّهِ
وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ
وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِّن رُّسُلِهِ وَقَالُوا
سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ.

"আমাদের রাসুল তো সেই বিষয়ের ওপর ঈমান এনেছেন, যা তাঁর প্রতিপালকের পক্ষ থেকে তার ওপর নাজিল করা হয়েছে এবং তার অনুসারীরাও। এরা সবাই আল্লাহর ওপর

ঈমান এনেছে এবং তাঁর ফেরেশতা, তাঁর কিতাবসমূহ ও তাঁর রাসুলদের ওপর ঈমান এনেছে। (তাদের স্বীকারোক্তি হলো:) আমরা আল্লাহর রাসুলদের কারও মধ্যে কোনো পার্থক্য করি না; এবং তারা বলে: আমরা শুনলাম ও আনুগত্যের মাথা নত করলাম। হে প্রতিপালক! আমরা তোমার ক্ষমা চাই এবং (আমরা জানি যে), আমাদেরকে ঘুরেফিরে তোমারই দরবারে পৌঁছাতে হবে।” (কুরআন, সুরা বাকারা, ২:২৮৫)

'আল্লাহর ওপর ঈমান'-এরই একটি শাখা হিসেবে আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) তাকদিরের ভালো-মন্দকে এর সাথে যুক্ত করে এগুলোকে এভাবে বর্ণনা করেছেন:

الإيمـان أن تـؤمن بـالله، وملٰئكتـه، وكتبـه، ورسله، واليوم الاٰخر، و تـؤمن بالقـدر خـيره وشره.

“ঈমান হলো: তুমি আল্লাহকে মানবে, তাঁর ফেরেশতাদের, তাঁর কিতাবসমূহকে এবং তাঁর রাসুলদের মানবে, আর আখিরাতের দিনকে মানবে এবং তোমার প্রতিপালকের পক্ষ থেকে

তাকদিরের ভালো-মন্দকেও মানবে।” (সহিহ মুসলিম, রেওয়ায়েত নম্বর: ৯৩)

এই ঈমান যখন নিজের হাকিকত বা প্রকৃত রূপ অনুযায়ী অন্তরে গেঁথে যায় এবং অন্তর থেকে নিজের সত্যায়ন লাভ করে, তখন তা আপন অস্তিত্বের তাগিদে দুটি জিনিসের দাবি করে:

এক, *আমলে সালেহ* (সৎকর্ম),

দুই, ‘তাওয়াসি বিল হক’ (সত্যের উপদেশ) এবং ‘তাওয়াসি বিস সবর’ (ধৈর্যের উপদেশ)।

বলা হয়েছে:

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

“সময় সাক্ষ্য দিচ্ছে যে: এই মানুষরা অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে পড়ে থাকবে। হ্যাঁ, তবে তারা ছাড়া, যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে এবং একে অপরকে সত্যের উপদেশ দিয়েছে ও সত্যের ওপর অবিচল থাকার উপদেশ

দিয়েছে।” (কুরআন, সুরা আসর, ১০৩:১-৩)

আমলে সালেহ বলতে সেসব কাজকে বোঝায়, যা চরিত্র সংশোধনের ফলে সৃষ্টি হয়। এর সমস্ত ভিত্তি বুদ্ধিবৃত্তি ও মানুষের সহজাত প্রকৃতির ওপর প্রতিষ্ঠিত এবং খোদার শরিয়ত এই আমলের দিকেই মানুষকে পথ দেখানোর জন্য নাজিল হয়েছে।

‘তাওয়াসি বিল হক’ এবং ‘তাওয়াসি বিস সবর’-এর অর্থ হলো: নিজের পরিবেশে একে অপরকে সত্যের এবং সত্যের ওপর অবিচল থাকার উপদেশ দেওয়া। কুরআন একে ‘আমর বিল মারুফ’ এবং ‘নাহি আনিল মুনকার’ হিসেবেও অভিহিত করেছে। অর্থাৎ যেসব বিষয় বুদ্ধিবৃত্তি ও মানুষের সহজাত প্রকৃতির দৃষ্টিতে ‘মারুফ’ (ভাল), নিজের নিকট পরিমণ্ডলে মানুষকে সেগুলোর প্রতি উপদেশ দেওয়া এবং যা ‘মুনকার’ (মন্দ), সেগুলো থেকে মানুষকে বিরত রাখা:

وَالْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيَاءُ بَعْضٍ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ.

"মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীরা একে অপরের বন্ধু ও সঙ্গী। (এই মুনাফিকদের বিপরীতে) তারা ভালোর উপদেশ দেয় এবং মন্দ থেকে বিরত রাখে।" (কুরআন, সুরা তওবা, ৯:৭১)

একইভাবে এটাও জরুরি যে, দুনিয়ায় যদি কোনো স্থানে ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্জিত হয়, তবে নিজেদের মধ্য থেকে কিছু লোককে এই কাজের জন্য আনুষ্ঠানিকভাবে নিযুক্ত করা হবে। বলা হয়েছে:

وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ.

"এবং উচিত যে, তোমাদের মধ্য থেকে কিছু লোক নিযুক্ত থাকুক: যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের উপদেশ দেবে এবং অসৎকাজ থেকে নিষেধ করবে। (তোমরা এই ব্যবস্থা গ্রহণ করো) এবং (মনে

রেখ) যারা এই কাজ করবে, তারাই সফল হবে।” (কুরআন, সুরা আলে ইমরান, ৩:১০৪)

স্পষ্টতই, এই দায়িত্ব কিছু ক্ষেত্রে প্রচার ও উপদেশের মাধ্যমে এবং কিছু ক্ষেত্রে আইনের শক্তির মাধ্যমে পালন করা হবে।[১৬] প্রথম রূপটির জন্য রয়েছে জুমার মিম্বার, যা এই উদ্দেশ্যেই শাসক ও নীতি-নির্ধারকদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছে; আর দ্বিতীয় রূপটির জন্য রয়েছে পুলিশ বিভাগ, যা মুসলিমদের রাষ্ট্রে এই দায়িত্ব পালনের জন্য প্রতিষ্ঠা করা হয়।

---

[১৬] এর মাধ্যমে মূলত সেসব বিধানকে বোঝানো হয়েছে, যা পালন করার নির্দেশ মুসলমান সমাজের সামষ্টিক সত্তাকে দেওয়া হয়েছে। এর বিপরীতে যেসব নির্দেশ ব্যক্তি হিসেবে মানুষকে দেওয়া হয়েছে, সেগুলোর বিষয়টি সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ ও বান্দার মধ্যকার ব্যক্তিগত ব্যাপার। এসব ক্ষেত্রে ব্যক্তি কোনো সরকার বা আইনের কাছে দায়বদ্ধ নয়; বরং কেবল তার নিজ প্রতিপালকের সামনেই জবাবদিহি করতে বাধ্য। এ ধরনের ক্ষেত্রে শিক্ষা-প্রশিক্ষণ ও উপদেশ-পরামর্শের গণ্ডির বাইরে সরকারের কোনো আইনগত অধিকার বা প্রশাসনিক কর্তৃত্ব নেই, যতক্ষণ না কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়া কিংবা জান, মাল ও সম্ভ্রমের ওপর কোনো আঘাত আসার আশঙ্কা তৈরি হয়।

ঈমানের এই দাবি প্রতিটি মুসলমানকে শুভাকাঙ্ক্ষা ও কল্যাণকামিতার ভাবধারা নিয়ে পূরণ করা উচিত। ধর্মের সঠিক চেতনার সাথে এই দায়িত্ব এই অনুভূতি ছাড়া কোনো অবস্থাতেই পূরণ করা সম্ভব নয়। আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর বক্তব্য:

الدين النصيحة، لله، ولكتابه، ولرسوله، ولأئمة المسلمين وعامتهم.

"ধর্ম হলো কল্যাণকামিতা: আল্লাহর জন্য, তাঁর কিতাবের জন্য, তাঁর রাসুলের জন্য, মুসলিমদের শাসকদের জন্য এবং তাদের সাধারণ জনগণের জন্য।" (সহিহ মুসলিম, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৯৬)

সাধারণ পরিস্থিতিতে ঈমানের দাবি এগুলোই, তবে মানুষ যে পৃথিবীতে বাস করে, সে মোতাবেক তার সামনে যেসব অবস্থা দেখা দিতে পারে, সেগুলোর প্রেক্ষিতে এই বিষয়গুলো ছাড়াও আরও তিনটি দাবি ঈমান থেকে সৃষ্টি হয়:

এক. হিজরত,

দুই. *নুসরাত* (সাহায্য),

তিন. *কিয়াম বিল কিস্ত* (ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা)।

কোনো মুমিন বান্দার জন্য যদি কোনো স্থানে নিজ প্রতিপালকের ইবাদতে অবিচল থাকা প্রাণান্তকর হয়ে উঠে, ধর্মের কারণে তাকে অতিষ্ঠ করা হয়, এমনকি নিজের ইসলাম প্রকাশ করাটা তার জন্য অসম্ভব হয়ে পড়ে, তবে তার এই ঈমান তার কাছে দাবি জানায় যে, সে ওই স্থান ত্যাগ করে এমন কোনো স্থানে চলে যাবে, যেখানে সে প্রকাশ্যে নিজের ধর্ম পালন করতে পারে। কুরআন একে 'হিজরত' বলে এবং নবীর পক্ষ থেকে হিজরতের দাওয়াতের পর নিজেকে এমন পরিস্থিতিতে দেখেও যারা এটিকে উপেক্ষা করে, তাদের জন্য কুরআন জাহান্নামের হুঁশিয়ারি শুনিয়েছে। সুরা নিসাতে বলা হয়েছে:

إِنَّ الَّذِينَ تَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ ظَالِمِي أَنفُسِهِمْ قَالُوا فِيمَ كُنتُمْ ۖ قَالُوا كُنَّا مُسْتَضْعَفِينَ فِي

الْأَرْضِ قَالُوا أَلَمْ تَكُنْ أَرْضُ اللَّهِ وَاسِعَةً فَتُهَاجِرُوا فِيهَا فَأُولَٰئِكَ مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَسَاءَتْ مَصِيرًا.

"(এই সুযোগেও যেসব লোক সেই জনপদ থেকে বের হতে প্রস্তুত নয়, যেখানে তাদেরকে ধর্মের কারণে নির্যাতন করা হচ্ছে, হে নবী! তাদেরকে বলুন): যাদের লোকের প্রাণ ফেরেশতারা এই অবস্থায় কবজ করবে যে, (নিজের ঈমানকে ঝুঁকিতে ফেলে) তারা নিজেদের ওপর জুলুম করছিল, তাদের কাছে ফেরেশতারা জানতে চাইবে: তোমরা কী অবস্থায় ছিলে? তারা উত্তর দেবে: আমরা তো এই দেশে একদম অসহায় ছিলাম। ফেরেশতারা বলবে: আল্লাহর জমিন কি এতটা প্রশস্ত ছিল না যে, তোমরা সেখানে হিজরত করে চলে যেতে? সুতরাং এদের ঠিকানা জাহান্নাম, আর তা কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা!" (কুরআন, সুরা নিসা, ৪:৯৭)

একইভাবে, ধর্মের প্রচার বা ধর্মের হেফাজতের জন্য যদি কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার প্রয়োজন দেখা দেয়, তবে ঈমানের

দাবি হলো: জান ও মাল দিয়ে ধর্মকে সাহায্য করা। কুরআনের পরিভাষা অনুযায়ী এটি খোদার 'নুসরাত' (সাহায্য)। আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) যখন মদিনায় কর্তৃত্ব অর্জন করেন, তখন 'নুসরাত'-এর প্রয়োজন দেখা দিল এবং মানুষের কাছে জিহাদ ও কিতাল তথা যুদ্ধের দাবি উত্থাপিত হলো, তখন কুরআন এক স্থানে এর আহ্বান মানুষের কাছে এভাবে পেশ করেছিল:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا هَلْ أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ تِجَارَةٍ تُنجِيكُم مِّنْ عَذَابٍ أَلِيمٍ ﴿١٠﴾ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١١﴾ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ ذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ ﴿١٢﴾ وَأُخْرَىٰ تُحِبُّونَهَا نَصْرٌ مِّنَ اللَّهِ وَفَتْحٌ قَرِيبٌ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ﴿١٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا أَنصَارَ اللَّهِ كَمَا قَالَ عِيسَى

ابْنُ مَرْيَمَ لِلْحَوَارِيِّينَ مَنْ أَنصَارِي إِلَى اللَّهِ قَالَ الْحَوَارِيُّونَ نَحْنُ أَنصَارُ اللَّهِ.

“হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদের এমন এক ব্যবসার সন্ধান দেব, যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক আজাব থেকে মুক্তি দেবে? (ইহুদিরা যে মনোভাব গ্রহণ করেছে তার বিপরীতে) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসুলের ওপর ঈমান আনবে, যেভাবে ঈমান আনা উচিত এবং তোমাদের জান ও মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করবে। এটি তোমাদের জন্য উত্তম, যদি তোমরা বুঝতে পার। এর বিনিময়ে আল্লাহ তোমাদের গুনাহ ক্ষমা করে দেবেন এবং তোমাদের এমন বাগানে প্রবেশ করাবেন, যার তলদেশ দিয়ে নদী প্রবাহমান এবং চিরস্থায়ী বাগানে থাকা চমৎকার বাসগৃহ দান করবেন। এটিই মহাসাফল্য। আর দ্বিতীয় আরেকটি জিনিসও দান করবেন, যা তোমরা পছন্দ করো, অর্থাৎ আল্লাহর সাহায্য ও নিকট বিজয়। (হে নবী!) ঈমানদারদেরকে এর সুসংবাদ দিন। হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও, যেমন ঈসা ইবনে মরিয়ম সহচরদের বলেছিলেন: আল্লাহর

দিকে কে আমার সাহায্যকারী হবে? সহচররা উত্তর দিয়েছিল: আমরা আল্লাহর সাহায্যকারী।” (কুরআন, সুরা সফ, ৬১: ১০-১৪)

পূর্বসূরী ও পরবর্তীদের মাঝে ধর্মের হেফাজত, স্থায়িত্ব এবং পুনরুজ্জীবন ও পুনর্জাগরণের যত কাজ হয়েছে, তা ঈমানের এই দাবি পূরণের জন্যই হয়েছে। উম্মতের ইতিহাসে জবান-কলম, তলোয়ার-বর্শা এবং দিরহাম-দিনার দিয়ে ধর্মের জন্য পরিচালিত প্রতিটি সংগ্রামের মূল উৎস এই ‘নুসরাত’ (সাহায্য)। কুরআনের দাবি হলো, ঈমানের এই দাবি যদি কোনো সময় সামনে উপস্থিত হয়, তবে মুমিন বান্দার কাছে দুনিয়ার কোনো কিছুই এর চেয়ে প্রিয় হওয়া উচিত নয়। নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর দাওয়াতে যখন এই পর্যায় আসলো, তখন কুরআন বলল:

قُلْ إِن كَانَ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ وَإِخْوَانُكُمْ وَأَزْوَاجُكُمْ وَعَشِيرَتُكُمْ وَأَمْوَالٌ اقْتَرَفْتُمُوهَا وَتِجَارَةٌ تَخْشَوْنَ كَسَادَهَا وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا أَحَبَّ إِلَيْكُم مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَجِهَادٍ فِي

سَبِيلِهِ فَتَرَبَّصُوا حَتَّىٰ يَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ ۗ وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ.

"(হে নবী!) এদের বলে দিন, যদি তোমাদের পিতা ও তোমাদের সন্তানগণ, তোমাদের ভাই, তোমাদের স্ত্রীগণ, তোমাদের পরিবার-পরিজন এবং তোমাদের অর্জিত সেই সম্পদ আর সেই ব্যবসা, যার মন্দা পড়ার ভয় তোমরা করো ও তোমাদের পছন্দনীয় ঘরবাড়ি— এসব কিছু তোমাদের কাছে আল্লাহ, তাঁর রাসুল এবং তাঁর পথে জিহাদ করার চেয়ে বেশি প্রিয় হয়, তবে অপেক্ষা করো, যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর সিদ্ধান্ত জারি করেন। আর (জেনে রাখ) এ ধরণের অবাধ্য লোকদের আল্লাহ সৎপথে পরিচালিত করবেন না।" (কুরআন, সুরা তওবা, ৯:২৪)

অতঃপর, এই দুনিয়ায় মানুষের আবেগ, পক্ষপাত, স্বার্থ এবং কামনা-বাসনা যদি ধর্ম বা দুনিয়ার কোনো বিষয়ে তাকে ইনসাফের পথ থেকে বিচ্যুত করতে চায়, তবে এই ঈমানই দাবি করে যে, মুমিন বান্দা কেবল সত্য ও ইনসাফের ওপর অবিচল থাকবে তাই নয়, বরং এগুলো যদি সাক্ষ্যের দাবি করে, তবে জীবনের

ঝুঁকি নিয়ে হলেও এসবের দাবি পূরণ করবে। সে সত্য বলবে, সত্যের সামনে নিজের মাথা নত করবে। ইনসাফ করবে, ইনসাফের সাক্ষ্য দেবে এবং নিজের আকিদা ও আমলে ইনসাফ ছাড়া কখনো কিছু গ্রহণ করবে না। এটিই হলো 'কিয়াম বিল-কিসত' (ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা), আর কুরআন মাজিদে এর নির্দেশ এভাবে বর্ণিত হয়েছে:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ إِن يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا فَلَا تَتَّبِعُوا الْهَوَىٰ أَن تَعْدِلُوا وَإِن تَلْوُوا أَوْ تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا.

"হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর জন্য তাঁর সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তোমরা ইনসাফের ওপর কায়েম থাক; যদিও এই সাক্ষ্য নিজের সত্তা, পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়দের বিরুদ্ধেও যায়। সে ধনী হোক বা দরিদ্র, আল্লাহই উভয় পক্ষের চেয়ে বেশি হকদার এই বিষয়ে (যে তাঁর আইনের আনুগত্য করা হবে)। সুতরাং (আল্লাহর নির্দেশ ছেড়ে) তোমরা খেয়ালখুশির

অনুসরণ করো না, যাতে এর ফলে সত্য থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়; আর (মনে রেখ) যদি (সত্য ও ইনসাফের কথাকে) বিকৃত করার বা (তা) এড়িয়ে যাওয়ার চেষ্টা করো, তবে তার শাস্তি অবশ্যই পাবে; কারণ তোমরা যা কিছু করো, আল্লাহ সে সম্পর্কে ভালোভাবে অবগত।" (কুরআন, সুরা নিসা, ৪:১৩৫)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ ۖ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ۚ اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ.

"হে ঈমানদারগণ! (এই অঙ্গীকার ও চুক্তির দাবি হলো) ইনসাফের সাক্ষ্য দিতে গিয়ে তোমরা আল্লাহর জন্য দাঁড়িয়ে যাও; আর কোনো জাতির শত্রুতা যেন তোমাদেরকে ইনসাফ থেকে বিচ্যুত হতে উৎসাহ না দেয়। ইনসাফ করো, এটি তাকওয়ার বেশি কাছাকাছি; আর আল্লাহকে ভয় করতে থাক, কারণ তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে সম্যক অবগত।" (কুরআন, সুরা মায়েদা, ৫:৮)

এই ধর্মের যে উদ্দেশ্য কুরআনে বর্ণিত হয়েছে, তা কুরআনের পরিভাষায় *তাজকিয়া*। এর অর্থ হচ্ছে: মানুষের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনকে পঙ্কিলতা থেকে পবিত্র করে তার চিন্তা ও কর্মকে সঠিক পথে বিকশিত করা। কুরআন মাজিদে এই কথা বিভিন্ন স্থানে বর্ণিত হয়েছে, মানুষের লক্ষ্য হচ্ছে: সর্বোচ্চ জান্নাত এবং رَاضِيَةً مَّرْضِيَّةً (*রাজিয়াতাম মারজিয়া: সন্তুষ্ট ও প্রিয়ভাজন*)-এর বাদশাহী; আর সফলতার এই স্থানে পৌঁছানোর নিশ্চয়তা কেবল তাদেরই জন্য, যারা এই দুনিয়ায় নিজেদের *তাজকিয়া* করে:

أَفْلَحَ مَن تَزَكَّىٰ ﴿١٤﴾ وَذَكَرَ اسْمَ رَبِّهِ فَصَلَّىٰ ﴿١٥﴾ بَلْ تُؤْثِرُونَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا ﴿١٦﴾ وَالْآخِرَةُ خَيْرٌ وَأَبْقَىٰ ﴿١٧﴾

“অবশ্যই সফল সে, যে পবিত্রতা অবলম্বন করল এবং এর জন্য নিজের রবের নাম স্মরণ করল, অতঃপর নামাজ আদায় করল। (হে মানুষ! তোমরা কোনো অজুহাত পাচ্ছ না) বরং দুনিয়ার জীবনকে প্রাধান্য দিচ্ছ, অথচ

আখিরাত তার চেয়ে উত্তম ও চিরস্থায়ী।" (কুরআন, সুরা আলা, ৮৭:১৪-১৭)

সুতরাং *তাজকিয়া*-ই হচ্ছে ধর্মের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য। আল্লাহর নবীগণ এই উদ্দেশ্যেই প্রেরিত হয়েছেন এবং সমগ্র ধর্ম এই উদ্দেশ্য অর্জন ও এই লক্ষ্যস্থলে পৌঁছানোর জন্য মানুষকে হেদায়েত করতেই নাজিল হয়েছে। বলা হয়েছে:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ.

"তিনি উম্মিদের মাঝে তাদেরই মধ্য থেকে একজন রাসুল পাঠিয়েছেন, যিনি তাদের নিকট তাঁর আয়াত তেলাওয়াত করেন এবং তাদের তাজকিয়া করেন, আর এর জন্য তাদেরকে কানুন ও হিকমা শিক্ষা দেন।" (কুরআন, সুরা জুমুআ, ৬২:২)

এই ধর্ম মোতাবেক আমল করার জন্য এর অনুসারীদের যে কর্মপন্থা অবলম্বন করা উচিত, তা হচ্ছে: 'ইহসান'। ইহসান-এর অর্থ: কোনো কাজকে তার সর্বোত্তম পদ্ধতিতে সম্পাদন করা।

ধর্মের কোনো কাজ যখন এমনভাবে করা হয় যে, তার আত্মিক রূপ ও বাহ্যিক কাঠামো—উভয়ই পূর্ণ ভারসাম্যের সাথে সামনে থাকে এবং এর প্রতিটি অংশ পূর্ণাঙ্গভাবে বজায় থাকে এবং তা সম্পাদনের সময় মানুষ নিজেকে আল্লাহর দরবারে উপস্থিত মনে করে, তখন তাকে 'ইহসান' বলে। আল্লাহতায়ালার বক্তব্য :

وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا.

"(ঈমানদারদের বিপরীতে এরা মুনাফিক মুশরিকদেরকে প্রাধান্য দেয়) এবং (বোঝে না যে), সেই ব্যক্তির চেয়ে কার ধর্ম উত্তম হতে পারে, যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পণ করে দেয় এবং সুন্দর উপায়ে কাজ করে, আর ইব্রাহিমের পথের অনুসরণ করে: যিনি ছিলেন একনিষ্ঠ।" (কুরআন, সুরা নিসা, ৪:১২৫)

নবী (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) তার অলঙ্কারপূর্ণ সাবলীল ভঙ্গিতে এর ব্যাখ্যা এভাবে প্রদান করেছেন:

الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه ، فإن لم تكن تراه فإنه يراك.

"'ইহসান' হলো তুমি আল্লাহর ইবাদাত এমনভাবে করবে যেন তুমি তাঁকে দেখছ; কারণ যদি তুমি তাঁকে নাও দেখ, তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন।" (সহিহ মুসলিম, রেওয়ায়েত নম্বর : ৯৩)

ইসলাম ও রাষ্ট্র

বর্তমানে কতিপয় চরমপন্থি সংগঠন তাদের অপতৎপরতার মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসলাম ও মুসলমানদের জন্য যে সংকটাপন্ন পরিস্থিতি তৈরি করেছে, তা মূলত সেই চিন্তাধারারই পরিণতি, যা আমাদের ধর্মীয় মাদরাসাগুলোতে অধ্যয়ন ও চর্চা করা হয় এবং বিভিন্ন ইসলামি আন্দোলন ও ধর্মীয় রাজনৈতিক দল দিন-রাত যার প্রচার-প্রসার চালিয়ে যাচ্ছে। এর বিপরীতে ইসলামের প্রকৃত দৃষ্টিভঙ্গি ও সঠিক চিন্তা কী—আমরা আমাদের 'মিজান' গ্রন্থে তা পর্যাপ্ত দলিল-প্রমাণসহ উপস্থাপন করেছি। এই প্রবন্ধটি মূলত তারই এক পাল্টা বয়ান। আমরা বারবার ব্যক্ত করেছি যে, মুসলিম সমাজে ধর্মের নামে যদি কোনো ফিতনা-ফাসাদ সৃষ্টি করা হয়, তবে সেক্যুলারিজম বা ধর্মনিরপেক্ষতার প্রচার নয়, বরং ধর্মীয় চিন্তারই একটি সুনির্দিষ্ট পাল্টা

বয়ান পরিস্থিতিকে সংশোধন করতে পারে। এর বিস্তৃত বিবরণের জন্য আমাদেরকে সেই মূল গ্রন্থ তথা ‘মিজান’-এর শরণাপন্ন হওয়া প্রয়োজন; তথাপি এর তাত্ত্বিক ও প্রাতিষ্ঠানিক রূপ স্পষ্ট করার সুবিধার্থে ওই বই থেকে ইসলাম ও রাষ্ট্রসংক্রান্ত অংশের একটি সারসংক্ষেপ আমরা এখানে উপস্থাপন করছি:

১. ইসলামের দাওয়াত মূলত ব্যক্তি কেন্দ্রিক। ইসলাম মানুষের মন ও মানসে নিজের আদর্শিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে চায়। ইসলাম সমাজকে যেসব বিধিবিধান প্রদান করেছে, সেগুলোর মূল উদ্দেশ্য ও সম্বোধনও মূলত সেসব ব্যক্তির প্রতিই নিবেদিত, যারা মুসলিম সমাজে নীতিনির্ধারক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। অতএব এই ধারণা একেবারেই ভিত্তিহীন যে, রাষ্ট্রের নিজস্ব কোনো ধর্ম রয়েছে এবং কোনো অবজেক্টিভ রেজোলিউশন (Objective Resolution) বা সাংবিধানিক ‘উদ্দেশ্য প্রস্তাব’-এর মাধ্যমে রাষ্ট্রকে প্রাতিষ্ঠানিকভাবে মুসলমান বানানোর কিংবা এই মর্মে সাংবিধানিক

বাধ্যবাধকতা আরোপ করার প্রয়োজন আছে যে, সেখানে কুরআন ও সুন্নাতের পরিপন্থী কোনো আইন প্রণয়ন করা যাবে না। যারা এই ধারণা পেশ করেছেন এবং রাষ্ট্রকে তা গ্রহণে বাধ্য করতে সক্ষম হয়েছেন, তারা বর্তমান যুগের জাতিরাষ্ট্রগুলোর (Nation States) অভ্যন্তরে স্থায়ী বিভাজনের গোড়াপত্তন করেছেন। তারা এসব রাষ্ট্রে বসবাসকারী অমুসলিমদের কাছে কার্যত এই বার্তাই পৌঁছে দিয়েছেন যে, তারা মূলত দ্বিতীয় শ্রেণির নাগরিক; যাদের বড়জোর একটি 'সুরক্ষিত সংখ্যালঘু' (protected minority) হিসেবে গণ্য হওয়ার সুযোগ রয়েছে এবং রাষ্ট্রের মূল স্বত্বাধিকারীদের কাছে তারা যদি কোনো অধিকার দাবি করতে পারে, তবে স্রেফ এই পরিচয়েই করতে পারে।

২. যেসব দেশে মুসলমানদের সংখ্যাগরিষ্ঠতা রয়েছে, তারা চাইলে নিজেদের সংগঠিত করে একটি 'ইউনাইটেড স্টেটস' বা যুক্তরাষ্ট্র গঠন করতে পারে। এটি আমাদের

প্রত্যেকের স্বপ্ন হতে পারে এবং তা বাস্তবায়নে আমরা নিরবচ্ছিন্ন সংগ্রামও করতে পারি; কিন্তু এই ধারণার কোনো ভিত্তি নেই যে, এটি ইসলামি শরিয়তের কোনো নির্দেশ, যা লঙ্ঘন করলে মুসলমানরা গুনাহগার হবে। মোটেও তা নয়; 'খিলাফত' কোনো ধর্মীয় পরিভাষা নয় এবং বৈশ্বিক পর্যায়ে তা প্রতিষ্ঠা করা ইসলামের কোনো আদেশও নয়। হিজরি প্রথম শতাব্দীর পরপরই যখন মুসলিম উম্মতের প্রথিতযশা আইনবিদগণ বিদ্যমান ছিলেন, তখনই মুসলমানদের দুটি পৃথক সাম্রাজ্য সুপ্রতিষ্ঠিত হয়েছিল— একটি বাগদাদে আব্বাসি খিলাফত এবং অন্যটি আন্দালুসে উমাইয়া খিলাফত, যা শতাব্দী ধরে স্থায়ী ছিল। কিন্তু তৎকালীন আইনবিদদের কেউই একে ইসলামি শরিয়তের লঙ্ঘন হিসেবে গণ্য করেননি। কারণ, এ বিষয়ে কুরআন ও হাদিসে আদতে সুনির্দিষ্ট কোনো নির্দেশনা নেই। তবে এর বিপরীতে একটি বিষয়ে সবাই একমত প্রকাশ করেছেন এবং আমরাও

বলি: যদি কোনো স্থানে মুসলমানদের সামষ্টিক ব্যবস্থা (অর্থাৎ রাষ্ট্র) সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তবে তা থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়া বা তা ভেঙে দেওয়া জঘন্যতম অপরাধ। যে বিষয়ে আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) সতর্ক করে বলেছেন, এই অপকর্মে লিপ্ত ব্যক্তি জাহিলিয়াতের মৃত্যুবরণ করবে।[১৭]

৩. ইসলামে জাতীয়তার ভিত্তি ‘ইসলাম’ নয়, যেমনটি সাধারণত ধারণা করা হয়। কুরআন ও হাদিসের কোথাও এটি বলা হয়নি যে, মুসলমানরা একটি নির্দিষ্ট জাতি অথবা তাদের একটি অভিন্ন জাতিতেই রূপ নিতে হবে; বরং বলা হয়েছে: إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ (মুসলমানরা পরস্পরের ভাই ভাই[১৮])। কুরআনের দৃষ্টিতে মুসলমানদের পারস্পরিক সম্পর্ক জাতীয়তাবাদী নয়, বরং ভ্রাতৃত্বের। তারা দশটি রাষ্ট্র কিংবা বিশটি দেশে বিভক্ত

---

[১৭] বুখারি, রেওয়ায়েত নম্বর: ৭০৫৩-৭০৫৪।

[১৮] কুরআন, সুরা হুজুরাত, ৪৯:১০।

থাকা সত্ত্বেও ঈমানের বন্ধনে একে অপরের ভাই। তাই তাদের কাছে এই দাবি তো করা যেতেই পারে এবং করা উচিত যে, তারা যেন নিজেদের ভাইদের খবরাখবর রাখে, তাদের বিপদ ও কষ্টে এগিয়ে আসে, তারা মজলুম হলে তাদের সহায়তা করে, সামাজিক ও অর্থনৈতিক সম্পর্কের ক্ষেত্রে তাদের অগ্রাধিকার দেয় এবং তাদের জন্য নিজেদের দরজা কোনো অবস্থাতেই বন্ধ না করে; কিন্তু এই দাবি তোলা যাবে না যে, নিজেদের জাতিরাষ্ট্র ও জাতীয় পরিচয় বিসর্জন দিয়ে আবশ্যিকভাবেই এক জাতি ও একক রাষ্ট্রে পরিণত হতে হবে। তারা যেভাবে নিজেদের পৃথক পৃথক জাতিরাষ্ট্র গঠন করতে পারে, ঠিক তেমনি ধর্ম ও শরিয়ত পালনের স্বাধীনতা থাকলে অমুসলিম সংখ্যাগরিষ্ঠ রাষ্ট্রে নাগরিক হিসেবে এবং ভূখণ্ডের ভিত্তিতে এক জাতি হয়ে বসবাসও করতে পারে। কুরআন ও সুন্নাতের দৃষ্টিতে এর কোনোটিই অবৈধ নয়।

৪. বিশ্বের যেসব মানুষ নিজেদেরকে মুসলমান হিসেবে স্বীকার করে এবং নিজ পরিচয়ে অটল থাকে, কিন্তু এমন কোনো আকিদা বা আমল গ্রহণ করে, যা কোনো আলেম বা আলেমসমাজ অথবা সাধারণ মুসলমান সঠিক মনে করেন না, তবে তাদের সেই আকিদা বা আমলকে ভুল বলা যেতে পারে, এমনকি তাকে বিভ্রান্তি বা গোমরাহিও বলা যেতে পারে; কিন্তু যেহেতু এর অনুসারীরা কুরআন ও হাদিস থেকেই নিজেদের পক্ষাবলম্বনে দলিল পেশ করে, তাই তাদেরকে অমুসলিম বা কাফের ঘোষণা করা যাবে না। এ ধরনের আকিদা ও আমলের ব্যাপারে আল্লাহর ফয়সালা কী— তার জন্য কিয়ামত পর্যন্ত অপেক্ষা করা উচিত। দুনিয়াতে এর অনুসারীরা নিজেদের স্বীকৃতি অনুযায়ী মুসলমান এবং তারা মুসলমান হিসেবেই গণ্য হবে। তাদের সাথে সমস্ত লেনদেন ও আচরণ সেভাবেই হবে, যেভাবে মুসলমান সমাজের একজন সদস্যের সাথে করা হয়। আলেমদের অধিকার রয়েছে তাদের ভুল তাদের সামনে

সুস্পষ্ট করার, তাদেরকে সঠিক সত্য গ্রহণের উদাত্ত আহ্বান জানানোর; তাদের আকিদা-বিশ্বাসে কোনো কিছু শিরক হলে তাকে শিরক এবং কুফর হলে তাকে কুফর বলার এবং সাধারণ মানুষকেও সে বিষয়ে সতর্ক করার। কিন্তু তাদের ব্যাপারে এই চূড়ান্ত ফয়সালা দেওয়া যে, তারা আর মুসলমান নেই কিংবা তাদেরকে মুসলমান সমাজ থেকে বহিষ্কার করা উচিত— এই অধিকার কারো নেই। কারণ, এই অধিকার একমাত্র আল্লাহই প্রদান করতে পারতেন; আর কুরআন ও হাদিস সম্পর্কে সম্যক অবগত প্রতিটি মানুষই জানেন যে, তিনি এই অধিকার কাউকে প্রদান করেননি।

৫. শিরক, কুফর ও ধর্মত্যাগ অবশ্যই গুরুতর অপরাধ, কিন্তু এই অপরাধের শাস্তি একজন মানুষ আরেকজন মানুষকে দেবে— এই এখতিয়ার কারো নেই। এটি একমাত্র আল্লাহর অধিকার। পরকালেও এর শাস্তি তিনিই প্রদান করবেন এবং দুনিয়াতেও যদি কখনো চান, তবে তিনিই দেন। পরকালের হিসাবনিকাশের বিষয়টি

এখন আলোচনার প্রসঙ্গ নয়। দুনিয়াতে এর রূপ এমন হয় যে, আল্লাহতায়ালা যখন কোনো জাতির ওপর তাঁর আদালতের রায় কার্যকর করার সিদ্ধান্ত নেন, তখন তাদের কাছে নিজের রাসুল প্রেরণ করেন। সেই রাসুল উক্ত জাতির সামনে সত্যকে চূড়ান্তভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত করার কাজ তথা ‘ইতমামে হুজ্জাত’ সম্পন্ন করেন, যাতে আল্লাহর দরবারে পেশ করার মতো কারো কাছে কোনো অজুহাত অবশিষ্ট না থাকে। অতঃপর আল্লাহর ফয়সালা নেমে আসে এবং যারা এভাবে সত্য সুস্পষ্ট হওয়ার পরও কুফর ও শিরকের ওপর অবিচল থাকে, তাদেরকে এই দুনিয়াতেই বিনাশ বা শাস্তির মুখোমুখি করা হয়। এটি আল্লাহর একটি অপরিবর্তনীয় বিধান (সুন্নাতুল্লাহ), যা কুরআন এভাবে বর্ণনা করেছে: “প্রত্যেক জাতির জন্যই একজন রাসুল রয়েছেন। অতঃপর যখন তাদের রাসুল উপস্থিত হন, তখন তাদের মধ্যে ইনসাফের সাথে ফয়সালা করা হয় এবং তাদের ওপর

কোনো জুলুম করা হয় না।”[১৯] এর ধরন ঠিক তেমনই, যা ইসমাইল (*আলাইহিস সালাম*)-এর কুরবানি এবং খিজির (*আলাইহিস সালাম*)-এর ঘটনায় আমাদের সামনে দৃশ্যমান হয়। সাধারণ মানুষের কর্মসীমার সাথে এর কোনো দূরতম সম্পর্কও নেই। আমরা যেভাবে কোনো দরিদ্র মানুষকে সাহায্য করার অজুহাতে তার অনুমতি ছাড়া তার নৌকায় ছিদ্র করতে পারি না, কোনো সন্তানকে বাবা-মায়ের অবাধ্য হতে দেখে তাকে হত্যা করতে পারি না, কিংবা নিজের কোনো স্বপ্নের ওপর ভিত্তি করে ইব্রাহিম (*আলাইহিস সালাম*)-এর মতো নিজের পুত্রের গলায় ছুরি চালাতে পারি না— ঠিক একইভাবে কোনো ব্যক্তিকে তার শিরক, কুফর বা ধর্মত্যাগের শাস্তিও দিতে পারি না; যতক্ষণ না প্রত্যক্ষ ওহি আসে এবং আল্লাহ তাঁর কোনো রাসুলের মাধ্যমে সরাসরি এর নির্দেশ প্রদান করেন। আর

[১৯] কুরআন, সুরা ইউনুস, ১০ : ৪৭।

প্রতিটি মানুষই অবগত আছেন যে, আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর পর ওহির সেই দরজা চিরতরে রুদ্ধ হয়ে গেছে।

৬. এতে কোনো সন্দেহ নেই যে, জিহাদ ইসলামের একটি বিধান। কুরআন তার অনুসারীদের কাছে এই দাবি পেশ করে যে, প্রয়োজনীয় শক্তি ও সামর্থ্য থাকলে তারা যেন জুলুম ও অন্যায়ের বিরুদ্ধে যুদ্ধ পরিচালনা করে। কুরআনে এর নির্দেশনা মূলত 'ফিতনা' নির্মূলের উদ্দেশ্যেই প্রদান করা হয়েছে। 'ফিতনা' অর্থ: কোনো ব্যক্তিকে জুলুম ও জবরদস্তির মাধ্যমে স্বধর্ম থেকে বিচ্যুত করার চেষ্টা; ইংরেজিতে যাকে persecution বলা হয়। বিজ্ঞজন মাত্রই অবগত যে, মুসলমানদেরকে এই নির্দেশ ব্যক্তিগত পর্যায়ে দেওয়া হয়নি; বরং তা দেওয়া হয়েছে জামাত বা সমষ্টিগত সত্তাকে। কুরআনে এই বিষয়ে যত আয়াত এসেছে, ব্যক্তিগত পর্যায়ে কোনো মুসলিম তার সরাসরি উদ্দেশ্য নয়। অতএব এ বিষয়ে যেকোনো পদক্ষেপ

গ্রহণের এখতিয়ার কেবল তাদের সামষ্টিক ব্যবস্থা অর্থাৎ রাষ্ট্রেরই রয়েছে। রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত কোনো ব্যক্তি বা গোষ্ঠী কোনো অবস্থাতেই স্বউদ্যোগে এ ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকার রাখে না। এ কারণেই আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) বলেছেন, "মুসলমানদের শাসক হলেন তাদের ঢালস্বরূপ, কেবল তার পেছনে থেকেই যুদ্ধ পরিচালনা করা হয়।"[২০]

৭. ইসলাম যে জিহাদের নির্দেশ দেয়, তা আল্লাহর পথে সংগ্রাম; তাই নৈতিক সীমালঙ্ঘন করে তা পরিচালনার কোনো অবকাশ নেই। নৈতিকতা সর্বাবস্থায় এবং সবকিছুর ঊর্ধ্বে। এমনকি যুদ্ধক্ষেত্রেও আল্লাহতায়ালা নৈতিকতার সীমা অতিক্রম করার অনুমতি কাউকে দান করেননি। অতএব এটি অত্যন্ত সুস্পষ্ট ও অকাট্য যে, জিহাদ কেবল প্রত্যক্ষ যুদ্ধরতদের (combatants) বিরুদ্ধেই পরিচালিত

[২০] বুখারি, রেওয়ায়েত নম্বর: ২৯৫৭।

হবে। ইসলামি আইনের মূলনীতি হলো: কেউ যদি কথা দিয়ে আক্রমণ করে, তবে তার উত্তর কথা দ্বারাই দেওয়া হবে; কেউ যদি যোদ্ধাদের আর্থিক সহায়তা জোগায়, তবে তাকে সেই অর্থ জোগান থেকে নিরস্ত করা হবে; কিন্তু যতক্ষণ না সে অস্ত্র হাতে সরাসরি লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয়, ততক্ষণ তার প্রাণহরণ করা যাবে না। এমনকি খোদ যুদ্ধক্ষেত্রেও শত্রুপক্ষ যদি অস্ত্র সমর্পণ করে, তবে তাকে স্রেফ বন্দি করা যাবে; কিন্তু হত্যা করা যাবে না। কুরআনে জিহাদের নির্দেশ যে আয়াতে দেওয়া হয়েছে, তার শব্দগুলো এমন: "তোমরা আল্লাহর পথে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করো, যারা তোমাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে; এবং সীমালঙ্ঘন করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের ভালোবাসেন না।"[২১] আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) যুদ্ধের ময়দানে নারী ও শিশুদের হত্যা করতে কঠোরভাবে নিষেধ

[২১] কুরআন, সুরা বাকারা, ২: ১৯০।

করেছেন।[২২] এর কারণ হলো: তারা যদি যোদ্ধাদের সাথে অভিযানে গমনও করে, তবুও সাধারণত তারা প্রত্যক্ষ যোদ্ধা নয়; বড়জোর তারা যোদ্ধাদের মনস্তাত্ত্বিক সাহস জোগাতে পারে কিংবা বাকপটুতা দিয়ে উৎসাহের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করতে পারে।

৮. আধুনিক যুগের পশ্চিমা চিন্তাবিদদের কয়েক শতাব্দী পূর্বেই কুরআন ঘোষণা করেছে: أَمْرُهُمْ شُورَى بَيْنَهُمْ (মুসলমানদের সামষ্টিক ব্যবস্থা তাদের পারস্পরিক পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন হবে[২৩])। এর সুস্পষ্ট তাৎপর্য হলো: মুসলমানদের সরকার তাদের সর্বসম্মত পরামর্শের ভিত্তিতেই প্রতিষ্ঠিত হবে। রাষ্ট্র পরিচালনা ও শাসনব্যবস্থা প্রাতিষ্ঠানিক পরামর্শের মাধ্যমেই অস্তিত্ব লাভ করবে। পরামর্শ বা মতামত প্রদানের ক্ষেত্রে প্রতিটি নাগরিকের অধিকার সমান। পরামর্শের ভিত্তিতে যা

[২২] বুখারি, রেওয়ায়েত নম্বর: ৩০১৫; মুসলিম, রেওয়ায়েত নম্বর: ১৭৪৪।

[২৩] কুরআন, সুরা শুরা, ৪২:৩৮।

গঠিত হবে, কেবল পরামর্শের মাধ্যমেই তা বিলুপ্ত করা যাবে। যে সামষ্টিক ব্যবস্থা গড়ে তোলার জন্য পরামর্শ করা হবে, প্রতিটি ব্যক্তির স্বাধীন মতামত তার অস্তিত্বের ভিত্তি হবে। সর্বসম্মত ঐকমত্য বা ইজমার মাধ্যমে ফয়সালা সম্ভব না হলে মতভেদ নিরসনে সংখ্যাগরিষ্ঠের মতামতকে গ্রহণ করা হবে।

মূলত এটিই গণতন্ত্র। অতএব স্বৈরতন্ত্র—তা কোনো পরিবারের হোক কিংবা কোনো শ্রেণি, গোষ্ঠী বা জাতীয় প্রতিষ্ঠানের হোক— কোনো অবস্থাতেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। এমনকি সামষ্টিক বিষয়াদি সংক্রান্ত ধর্মীয় বিধানের ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ধর্মীয় বিশেষজ্ঞদের একনায়কত্বও মোটেও কাম্য নয়। তারা অবশ্যই নিজেদের ব্যাখ্যা ও মতামত প্রকাশের অধিকার রাখেন; কিন্তু তাদের সেই মতামত জনগণের জন্য পালনীয় আইন হিসেবে তখনই গণ্য হবে, যখন জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশ তা অনুমোদন করবে। আধুনিক রাষ্ট্রব্যবস্থায়

‘পার্লামেন্ট’ নামক প্রতিষ্ঠান এই উদ্দেশ্যে গড়ে উঠেছে। রাষ্ট্র পরিচালনায় চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের এখতিয়ার কেবল তারই এবং তা-ই হওয়া উচিত। পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তের গঠনমূলক সমালোচনা করার কিংবা ভুলগুলো চিহ্নিত করার অধিকার নাগরিকদের অবশ্যই রয়েছে; কিন্তু আইন লঙ্ঘন করা কিংবা রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে সশস্ত্র বিদ্রোহে লিপ্ত হওয়ার অধিকার কারো নেই। আলেমসমাজ কিংবা রাষ্ট্রের বিচার বিভাগ— কারো অবস্থানই পার্লামেন্টের ঊর্ধ্বে হতে পারে না। ‘আমরুহুম শুরা বাইনাহুম’ নীতি প্রতিটি ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই মর্মে বাধ্য করে যে, পার্লামেন্টের সিদ্ধান্তের সাথে নীতিগত দ্বিমত থাকলেও ব্যবহারিক ক্ষেত্রে তারা সেই সিদ্ধান্তের প্রতি অনুগত থাকবে। ইসলামে সরকার গঠন ও রাষ্ট্র পরিচালনার এটিই একমাত্র বৈধ রূপরেখা। এর বাইরে যেভাবে যে সরকারই প্রতিষ্ঠিত হোক না কেন, তা অবৈধ সরকার হিসেবে গণ্য হবে— চাই সেই সরকারপ্রধানের কপালে

সেজদার দাগ থাকুক কিংবা তাকে ‘আমিরুল মুমিনিন’ উপাধিতে ভূষিত করা হোক না কেন।

৯. কোনো অঞ্চলে মুসলমানদের সরকার প্রতিষ্ঠিত হলে সাধারণত তার নিকট ‘শরিয়া আইন বাস্তবায়নের’ দাবি তোলা হয়। এই পরিভাষাটি প্রকৃতপক্ষে বিভ্রান্তিকর; কেননা এর দ্বারা এমন এক ধারণার উদ্রেক ঘটে যাতে মনে হয়: ইসলাম সরকারকে এই অধিকার দিয়েছে যে, সরকার শরিয়তের যাবতীয় বিধান রাষ্ট্রের প্রশাসনিক শক্তির জোরে মানুষের ওপর জোরপূর্বক চাপিয়ে দিতে পারে। অথচ কুরআন ও হাদিসের কোথাও কোনো সরকারের জন্য এমন রাজকীয় বা স্বৈরাচারী অধিকার ন্যস্ত করা হয়নি। ইসলামি শরিয়তে দুই ধরনের বিধান রয়েছে— এক, যেসব বিধান কোনো ব্যক্তিকে ‘ব্যক্তি’ হিসেবে দেওয়া হয়েছে; এবং দুই, যেসব বিধান দেওয়া হয়েছে মুসলমান সমাজের সামষ্টিক সত্তাকে। প্রথম প্রকারের বিধান সম্পূর্ণভাবে আল্লাহ ও

বান্দার মধ্যকার ব্যক্তিগত বিষয়; এখানে ব্যক্তি কোনো পার্থিব সরকারের কাছে দায়বদ্ধ নয়, বরং কেবল তার প্রতিপালকের কাছেই জবাবদিহি করতে বাধ্য। অতএব পৃথিবীর কোনো সরকার, উদাহরণস্বরূপ: কাউকে রোজা রাখা, হজ্জ ও ওমরা আদায় করা, খতনা করা বা গোঁফ ছাঁটার বিষয়ে বাধ্য করতে পারে না; কিংবা নারী হলে তাকে বুক আবৃত রাখা, রূপসজ্জার প্রসাধনী প্রদর্শন না করা কিংবা স্কার্ফ পরিধান করে বাইরে বের হতে জোরজবরদস্তি করতে পারে না। এ জাতীয় বিষয়ে শিক্ষা প্রদান ও উপদেশ-পরামর্শের বাইরে সরকারের কোনো আইনগত এখতিয়ার নেই; যদি না এতে অন্য কারো অধিকার ক্ষুণ্ণ হওয়া কিংবা জান, মাল ও সম্ভ্রমের ওপর কোনো ধরনের জুলুমের আশঙ্কা থাকে। কুরআন সুস্পষ্ট ভাষায় তুলে ধরেছে যে, ধর্মের ইতিবাচক বা করণীয় বিধানগুলোর মধ্যে কেবল সালাত ও যাকাতই এমন দুটি বিষয়, যার তাগিদ বা দাবি মুসলমানদের সামষ্টিক ব্যবস্থা

চাইলে আইনের শক্তিতে প্রয়োগ করতে পারে। কুরআনের স্পষ্ট ঘোষণা হলো: এ দুটি সম্পন্ন করার পর রাষ্ট্র বাধ্য থাকবে তাদের পথ ছেড়ে দিতে এবং অন্য কোনো বিধান তাদের ওপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবে না।[২৪] দ্বিতীয় প্রকারের বিধানগুলোর আসল লক্ষ্য হলো রাষ্ট্র বা সরকার; কারণ সামষ্টিক বিষয়াবলিতে রাষ্ট্রই পুরো সমাজের প্রতিনিধিত্ব করে। আলেমসমাজ যদি নীতিনির্ধারকদের কাছে সেসব সামষ্টিক বিধান পালনের দাবি জানান, তবে তারা অবশ্যই সত্যের ওপর থাকবেন এবং নিজেদের সুনির্দিষ্ট মর্যাদা ও দায়িত্বের নিরিখে তা করা তাদের জন্য আবশ্যক। তবে এটি মূলত 'শরিয়ত পালনের দাওয়াত'; 'শরিয়া আইন বাস্তবায়ন' শব্দগুচ্ছ কোনোক্রমেই এর জন্য উপযুক্ত পরিভাষা হতে পারে না।

[২৪] কুরআন, সুরা তওবা, ৯:৫।

সামষ্টিক প্রকৃতির এই দ্বিতীয় প্রকারের বিধানগুলো নিম্নরূপ:

ক. মুসলমানরা তাদের শাসকদের প্রজা নয়, বরং সমান অধিকারসম্পন্ন নাগরিক হিসেবে গণ্য হবে। আইন ও রাষ্ট্রীয় পরিসরে তাদের মাঝে উচ্চ-নিচ কিংবা অভিজাত ও সাধারণ শ্রেণিতে কোনো বৈষম্য করা যাবে না। তাদের জান, মাল ও সম্ভ্রম পবিত্র বলে গণ্য হবে। এমনকি সরকার তাদের সুস্পষ্ট সম্মতি ব্যতিরেকে যাকাত ছাড়া অন্য কোনো কর বা ট্যাক্সও তাদের ওপর আরোপ করতে পারবে না। তাদের ব্যক্তিগত বিষয়াবলি— অর্থাৎ বিবাহ, তালাক, মিরাস বণ্টন, লেনদেন এবং এ জাতীয় যেকোনো বিরোধ— ইসলামি শরিয়ত অনুযায়ী নিষ্পত্তি করা হবে। দৈনন্দিন নামাজ, রমজানের রোজা এবং হজ্জ ও ওমরা আদায়ের জন্য তাদের যাবতীয় প্রয়োজনীয় সুযোগ-সুবিধা প্রদান করা হবে। তাদের ওপর

ন্যায়বিচারের ভিত্তিতে এবং 'আমরুহুম শুরা বাইনাহুম' নীতিতে শাসনকার্য পরিচালিত হবে। তাদের জাতীয় সম্পদসমূহ সামষ্টিক প্রয়োজনের জন্য সংরক্ষিত থাকবে; সেগুলো ব্যক্তিগত মালিকানায় সোপর্দ করা হবে না। বরং এমন প্রাতিষ্ঠানিক প্রক্রিয়ায় তার প্রবৃদ্ধি ঘটানো হবে, যেন অর্থনৈতিক দৌড়ে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীও এই সম্পদের আয় থেকে নিজেদের মৌলিক চাহিদা পূরণ করতে পারে। তারা যখন ইহজগৎ থেকে বিদায় নেবে, তখন মুসলমান রীতি অনুযায়ী তাদের কাফন-দাফন সম্পন্ন হবে, জানাজা অনুষ্ঠিত হবে এবং মুসলমানদের কবরস্থানে নিয়ম মেনে দাফন করা হবে।

খ. জুমার নামাজ ও দুই ঈদের নামাজের আয়োজন রাষ্ট্র বা সরকার পরিচালনা করবে। এই নামাজগুলো কেবল সেসব নির্ধারিত স্থানেই অনুষ্ঠিত হবে, যা সরকারের পক্ষ থেকে সুনির্দিষ্ট করা

হবে। এসব নামাজের মিম্বর কেবল শাসকদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। তারা নিজেরা এসব নামাজের খুতবা প্রদান করবেন ও ইমামতি করবেন, অথবা তাদের নির্ধারিত প্রতিনিধি এই দায়িত্ব পান করবে। রাষ্ট্রের ভৌগোলিক সীমানার অভ্যন্তরে কোনো ব্যক্তি নিজ উদ্যোগে এসব নামাজের পৃথক আয়োজন করতে পারবে না।

গ. আইন প্রয়োগকারী সংস্থাগুলো মূলত ‘আমর বিল মারুফ ও নাহি আনিল মুনকার’ (সৎকাজের আদেশ ও অসৎকাজের নিষেধ)-এর প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করবে। ফলে সমাজের সর্বাপেক্ষা সৎ, খোদাভীরু ও যোগ্য ব্যক্তিবর্গকে এই প্রতিষ্ঠানের সদস্য নির্বাচন করা হবে। তারা মানুষকে সৎকাজের উপদেশ প্রদান করবে এবং সেসব অপকর্ম থেকে বিরত রাখবে, যা মানবজাতি আবহমানকাল ধরে মন্দ ও গর্হিত হিসেবে গণ্য করে

আসছে। তবে আইনের প্রশাসনিক শক্তি কেবল তখনই প্রয়োগ করা যাবে, যখন কোনো ব্যক্তি অন্যের অধিকার হরণ করবে কিংবা কারো জান, মাল বা সম্ভ্রমের ওপর আঘাত হানার অপচেষ্টা চালাবে।

ঘ. সরকার শত্রুপক্ষের সাথে আচরণের ক্ষেত্রেও সর্বদা ন্যায়নিষ্ঠ ও সমদর্শী থাকবে। সত্য উচ্চারণ করবে, সত্যের সাক্ষ্য দেবে এবং সত্য ও ন্যায়বিচার থেকে বিচ্যুত হয়ে কখনো কোনো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে না।

ঙ. রাষ্ট্রের অভ্যন্তরে বা আন্তর্জাতিক পরিসরে কারো সাথে যদি কোনো চুক্তি সম্পাদিত হয়ে থাকে, তবে চুক্তি কার্যকর থাকা পর্যন্ত তার প্রতিটি শর্ত ও মূলভাব— উভয় দিক থেকেই পূর্ণ সততা ও আমানতদারির সাথে রক্ষা করা হবে।

চ. মানুষ হত্যা ও ফাসাদ ফিল আরদ (জমিনে বিশৃঙ্খলা) ব্যতীত অন্য

কোনো অপরাধের জন্য কাউকে মৃত্যুদণ্ড দেওয়া যাবে না। এ ছাড়া রাষ্ট্রের কোনো মুসলমান নাগরিক যদি জিনা-ব্যভিচার, চুরি, নরহত্যা, ফাসাদ ফিল আরদ (জমিনে বিশৃঙ্খলা) এবং কাজফ (সতী নারীকে অপবাদ দেওয়া)-এর মতো অপরাধে লিপ্ত হয় এবং আদালত নিশ্চিত হয় যে, অপরাধী তার ব্যক্তিগত, পারিবারিক ও সামাজিক পারিপার্শ্বিকতার আলোকে কোনো শিথিলতা বা ছাড় পাওয়ার যোগ্য নয়, তবে তার ওপর সেই দণ্ডাদেশ কার্যকর করা হবে, যা আল্লাহতায়ালা তাঁর কিতাবে সুনির্দিষ্ট করেছেন। ইসলামের দাওয়াতকে পূর্ণ সচেতনতা ও চিত্তের প্রশান্তির সাথে কবুল করার পর যারা এই অপরাধগুলোতে লিপ্ত হবে, তাদের জন্যই মূলত এই দণ্ড নির্ধারিত।

ছ. ইসলামের দাওয়াত বিশ্বের প্রতিটি প্রান্তরে পৌঁছে দেওয়ার উদ্দেশ্যে

রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগ গ্রহণ করা হবে। বিশ্বের কোনো পরাশক্তি যদি এতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে কিংবা ঈমানদারদের ওপর জুলুম-নিপীড়ন চালায়, তবে সরকার নিজ সামর্থ্য ও শক্তি অনুযায়ী সেই প্রতিবন্ধকতা অপসারণ এবং নিপীড়ন বন্ধের চেষ্টা চালাবে— যদিও এর জন্য অস্ত্র ধারণ করতে হয়।[২৫]

১০. সামষ্টিক ব্যবস্থা তথা রাষ্ট্রসংক্রান্ত শরিয়তের এই বিধানগুলো কঠোর সতর্কবাণী ও হুঁশিয়ারির সাথে প্রদান করা হয়েছে যে, যারা আল্লাহর কিতাবের প্রতি ঈমান আনার পর এসব বিষয়ে আল্লাহর অবতীর্ণ আইন অনুযায়ী ফয়সালা করে না, কিয়ামতের দিন তারা আল্লাহর দরবারে জালিম, ফাসেক ও কাফের হিসেবে গণ্য হবে। তবে মুসলমানদের নীতিনির্ধারকরা যদি এরপরও এ বিষয়ে অবহেলা করে

২৫ ইসলামের উৎসসমূহে এই বিধানগুলোর দলিলের জন্য দেখুন, আমাদের বই ‘মিজান’।

কিংবা অবাধ্যতা প্রদর্শন করে, তবে আলেম ও সংস্কারকদের দায়িত্ব এ ছাড়া আর কিছুই নয় যে, তারা দুনিয়া ও আখিরাতে এর পরিণতি সম্পর্কে তাদেরকে সতর্ক করবেন। তারা প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের মাধ্যমে তাদেরকে সঠিক পথ অবলম্বনের আহ্বান জানাবেন, তাদের জিজ্ঞাসার মুখোমুখি হবেন, তাদের সংশয় নিরসন করবেন এবং যৌক্তিক প্রমাণের ভিত্তিতে তাদেরকে স্পষ্ট করবেন যে, আল্লাহতায়ালা কেন তাঁর শরিয়ত অবতীর্ণ করেছেন? সামষ্টিক জীবনের সাথে তার সম্পর্ক কোথায়? সেখানে এসব বিধানের ভিত্তি কী এবং আধুনিক যুগের মানুষের জন্য তা অনুধাবন করতে কেন অসুবিধা হচ্ছে? শরিয়ত অনুধাবনের জন্য তারা এমন সব প্রজ্ঞাপূর্ণ পদ্ধতি অবলম্বন করবেন, যাতে শরিয়তের হিকমত, যৌক্তিক সার্থকতা ও এর উদ্দেশ্যসমূহ তাদের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে ওঠে এবং তাদের মন ও মানস পূর্ণ তৃপ্তির সাথে তা গ্রহণ করতে ও তার ওপর আমল করতে প্রস্তুত হয়। কুরআনে আলেম ও

সংস্কারকদের মূল দায়িত্বকে ‘দাওয়াত ও ইনজার’ (আহ্বান ও সতর্কীকরণ) হিসেবে অভিহিত করা হয়েছে। তারা তাদের জাতি ও তার নীতিনির্ধারকদের ওপর ‘দারোগা’ (নিয়ন্ত্রক) হিসেবে নিযুক্ত হননি যে, নিজেদের অনুসারীদের দিয়ে দল গঠন করে বন্দুকের জোরে তাদের ওপর জোরপূর্বক শরিয়া আইন চাপিয়ে দেওয়ার চেষ্টা করবেন।

নাহি আনিল মুনকার

ঈমানের এক অপরিহার্য দাবি হলো: মানুষকে কল্যাণের উপদেশ প্রদান করা এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখা। এই উপদেশ দান ও বিরত রাখা— উভয়ই প্রজ্ঞা ও সদুপদেশের নীতিতে এবং দাওয়াত ও নসিহতের স্বতঃস্ফূর্ত ভঙ্গিতে হওয়া আবশ্যক। মানুষের হেদায়েত ও গোমরাহির বিষয়টি আল্লাহতায়ালা সম্পূর্ণ নিজের হাতে রেখেছেন। তিনি তাদেরকেও চেনেন, যারা তাঁর পথ থেকে বিচ্যুত এবং তাদেরকেও চেনেন, যারা হেদায়েতপ্রাপ্ত। অতএব সত্য ও ন্যায়ের দাওয়াত পেশ করতে গিয়ে কোনো ব্যক্তির 'দারোগা' বা নিয়ন্ত্রক হওয়ার অবকাশ নেই; কিংবা নিজের সম্বোধিত মানুষদের জন্য জান্নাত বা জাহান্নামের চূড়ান্ত ফয়সালা দেওয়ারও কোনো অধিকার নেই। এ বিষয়ে কুরআন একেবারে স্পষ্ট যে, সত্যের

আহ্বানকারী হিসেবে আল্লাহর কোনো নবীকেও তাজকির (স্মরণ করানো), নসিহত এবং ‘বালাগে মুবিন’ (সুস্পষ্ট প্রচার)-এর গণ্ডির বাইরে অন্য কোনো পদক্ষেপ নেওয়ার অনুমতি দেওয়া হয়নি। এ প্রসঙ্গে আল্লাহতায়ালার ঘোষণা:

فَذَكِّرْ إِنَّمَا أَنتَ مُذَكِّرٌ ﴿٢١﴾ لَّسْتَ عَلَيْهِم بِمُصَيْطِرٍ ﴿٢٢﴾

> “আপনি তো কেবল উপদেশদাতা, তাদের ওপর কোনো দারোগা নন।” (কুরআন, সুরা গাশিয়া, ৮৮: ২১-২২)

তবে এখতিয়ার বা কর্তৃত্বের পরিধির বিষয়টি ভিন্ন। প্রাপ্তবয়স্ক হওয়ার পর একজন পুরুষ কোনো নারীর স্বামী এবং তার পরিণতিতে সন্তানদের পিতা হয়ে ওঠেন। মানুষের এই উভয় পরিচয় ধর্ম ও ফিতরাতের দৃষ্টিতে তাদের জন্য একটি এখতিয়ারভুক্ত ক্ষেত্র তৈরি করে। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও সরকারগুলোর ক্ষেত্রেও একই নিয়ম প্রযোজ্য। এগুলো যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, তখন এগুলোর কর্ণধারদের জন্যও স্বকীয় এখতিয়ারের একটি পরিধি গড়ে ওঠে। আল্লাহর

রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*) এই দায়িত্বের গণ্ডির ভেতরে সংঘটিত মন্দ কাজের বিষয়ে নির্দেশ প্রদান করে বলেছেন:

من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان.

“তোমাদের কেউ যদি কোনো মন্দ কাজ হতে দেখে, তবে সে যেন হাত দিয়ে তা প্রতিহত করে। যদি তার সেই সামর্থ্য না থাকে, তবে যেন মুখ দিয়ে (কথা বলে তা প্রতিহত করে); আর যদি তাতেও সক্ষম না হয়, তবে যেন অন্তর দিয়ে তা ঘৃণা করে। আর এটিই হলো ঈমানের দুর্বলতম স্তর।” (সহিহ মুসলিম, রেওয়ায়েত নম্বর:১৭৭)

মন্দ কাজ বোঝাতে এই রেওয়ায়েতে ‘মুনকার’ (مُنْكَر) শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। এর দ্বারা স্রেফ সেসব অন্যায়কে বোঝানো হয়নি, যা নিছক কোনো পারিবারিক বা ব্যক্তিগত ধর্মীয় আচারবিধান লঙ্ঘনের ফলে সৃষ্টি হয়; বরং এর দ্বারা এমন সব মন্দ কাজকে বোঝানো হয়েছে, যেগুলোকে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমগ্র মানবজাতি

আবহমানকাল ধরে মন্দ ও অন্যায় হিসেবেই গণ্য করে আসছে। চুরি, মিথ্যাচার, অসাধুতা, আত্মসাৎ, খিয়ানত, ওজন ও মাপে কম দেওয়া, ভেজাল মেশানো, অধিকার হরণ, অশ্লীলতা, জীবন-সম্পদ ও সম্ভ্রমের ক্ষতিসাধন এবং এ জাতীয় অপরাপর মন্দ কাজকে আরবি ভাষায় 'মুনকার' পরিভাষা দিয়ে প্রকাশ করা হয়। আল্লাহর রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর এই বাণী মূলত উল্লিখিত সামাজিক ও নৈতিক অপরাধসমূহের সাথেই সম্পর্কিত। কুরআনে 'আমর বিল মারুফ' ও 'নাহি আনিল মুনকার'-এর যে নির্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে, এই হাদিসটি তারই ব্যবহারিক ও ঈমানি শাখা। তিনি সতর্ক করে বলেছেন: নিজের এখতিয়ারভুক্ত ক্ষেত্রের ভেতরে সংঘটিত এসব মন্দ কাজকে যদি কেউ অন্তর থেকেও ঘৃণা না করে, তবে এরপর আর ঈমানের কোনো স্তর বা পর্যায় অবশিষ্ট থাকে না।

এই রেওয়ায়েতে উল্লিখিত فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ (যদি সক্ষম না হয়) শব্দগুচ্ছের তাৎপর্য অনুধাবন করা আবশ্যক। এর দ্বারা সেই সক্ষমতা বা সামর্থ্যকে বোঝানো হয়নি, যা

মানুষকে কোনো কাজের জন্য দায়বদ্ধ করে; কেননা সেই সক্ষমতা না থাকার কারণে কেউ যদি কোনো নির্দেশ পালন করতে না পারে, তবে সেই কারণে সে ঈমানের কোনো নিম্নতর স্তরে নেমে যায় না। আলোচ্য রেওয়ায়েতে এই শব্দগুচ্ছ মূলত নৈতিক সাহস, আত্মিক শক্তি ও হিম্মতের অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে, যা অন্তরের ঈমানি শক্তি বা দুর্বলতার তারতম্যের কারণে কমবেশি হতে পারে। অতএব এই সক্ষমতা কেবল নিজের এখতিয়ার বা শক্তির প্রয়োগ-ক্ষেত্র; যেখানে কোনো ব্যক্তি যদি বস্তুগত ক্ষমতা থাকা সত্ত্বেও হাত দিয়ে কোনো মন্দ কাজ প্রতিহত না করে, তবে তার সম্পর্কে বলা যাবে যে, ঈমানের প্রথম স্তরে সে ব্যক্তি অধিষ্ঠিত নেই; কেননা ক্ষমতা ও শাসনের অধিকার থাকা সত্ত্বেও সে মন্দ কাজ বন্ধের চেষ্টা করেনি। তবে এর অর্থ কখনো এটি নয় যে, ঈমানের এই স্তর অর্জনের উদ্দেশ্যে সাধারণ মানুষ তাদের অনুসারীদের মাধ্যমে বাহিনী সংগঠিত করবে এবং মন্দ নির্মূলের নামে নিজ উদ্যোগে অভিযানে বের হবে। এ জাতীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হলে তা সমাজে ঘোরতর বিশৃঙ্খলা ও

ফাসাদের জন্ম দেবে, যার কোনো সুযোগ ধর্মে নেই। ধর্মের প্রতিটি বিধানই মানুষের এখতিয়ার ও তার সাধ্যের সীমা বিবেচনা করেই নির্ধারিত হয়েছে।لَا يُكَلِّفُ اللّٰهُ نَفْسًا اِلَّا وُسْعَهَا[২৬]— এক অকাট্য মূলনীতি, যা ধর্ম ও শরিয়তের সকল বিধানে বিবেচনায় রাখা হয়েছে। *নাহি আনিল মুনকার* সম্পর্কে রাসুল (*সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম*)-এর বাণীসমূহকে এই মূলনীতির আলোকে অনুধাবন করা কর্তব্য।

---

২৬ কুরআন, সুরা বাকারা, ২:২৮৬। অর্থ: “(বাস্তবতা হচ্ছে), আল্লাহ কারো ওপর তার সাধ্যের বাইরে বোঝা চাপিয়ে দেন না।”

দুনিয়ার সমস্ত মানুষকে আমরা এই ধর্মের ওপর ঈমান আনতে এবং এই ধর্ম মোতাবেক নিজেদের ব্যক্তিগত ও সামষ্টিক জীবনের আত্মশুদ্ধির আহ্বান জানাই। যারা এই আহ্বান কবুল করবে, তাদের প্রতিদান আল্লাহর জান্নাত, যার প্রশস্ততা পুরো মহাবিশ্বের প্রশস্ততার সমান; যেখানে জীবনের সাথে মৃত্যু, আনন্দের সাথে বেদনা, খুশির সাথে দুঃখ, প্রশান্তির সাথে অস্থিরতা, আরামের সাথে কষ্ট এবং নিয়ামতের সাথে আজাবের কোনো চিন্তা নেই; যার আরাম স্থায়ী, যার স্বাদ অসীম, যার দিন-রাত চিরন্তন, যার নিরাপত্তা অবিনশ্বর, যার আনন্দ অক্ষয়, যার সৌন্দর্য চিরস্থায়ী এবং পূর্ণতা সীমাহীন। আল্লাহতায়ালা তাঁর বান্দাদের জন্য এতে এমন কিছু প্রস্তুত রেখেছেন, যা কোনো চোখ দেখেনি, কোনো কান শোনেনি এবং কোনো মানুষের হৃদয় তা কখনো কল্পনাও করেনি।

জাভেদ আহমেদ গামিদি